রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

সৈয়দ আবুল মকসুদ

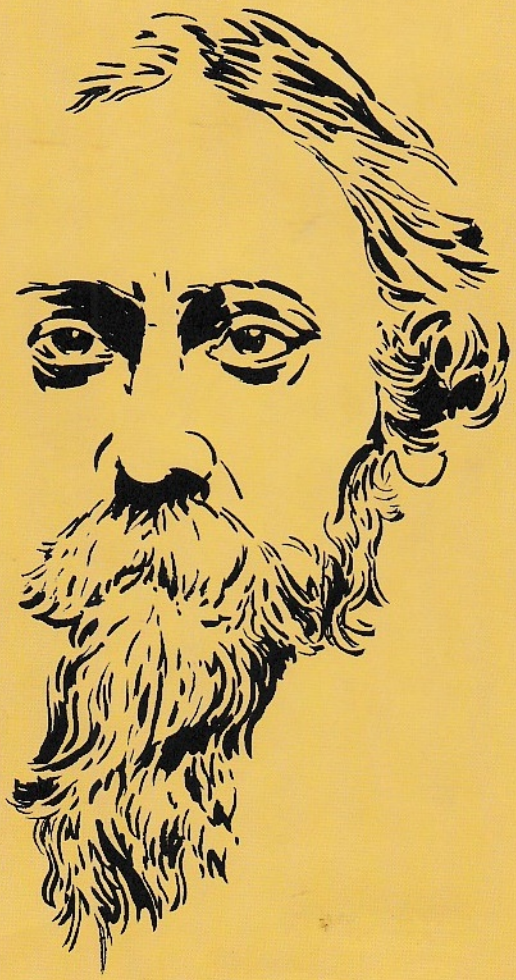

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁর দার্শনিক-সত্তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচ্যের ভাববাদী দর্শনে রবীন্দ্রনাথের অবদান অসামান্য। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের সঙ্গে হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ভাববিনিময়। তাঁর দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আগেও লেখা হয়েছে, কিন্তু সৈয়দ আবুল মকসুদ দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ রবীন্দ্রনাথের এমন কিছু দিক এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন, যা আগে আর কোনো বইয়ে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়নি। *রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন* তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ এক অভিসন্দর্ভ।

ISBN 978 984 90192 8 2
9 789849 019282

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মহত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা। তাঁর প্রধান পরিচয় কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হলেও বাঙালি জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তাঁর কর্ম ও চিন্তায় সমৃদ্ধতর হয়নি। প্রথাগত দার্শনিক তিনি নন, কিন্তু দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেও তাঁর অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে এর আগে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে। সৈয়দ আবুল মকসুদ এই বইয়ে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনচিন্তার এমন কিছু দিক, যা অন্য কোনো বইয়ে আলোচিত হয়নি। ১৯টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি ও তাঁর মানবধর্মতত্ত্ব শুধু নয়, তাঁর দর্শনচিন্তায় বাংলার লোকজ মানবধর্ম ও সুফিবাদের প্রভাব এবং অন্যান্য প্রধান ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর অভিমতও। তাঁর সঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেল, বেনেদেত্তো ক্রোচেসহ দেশি-বিদেশি দার্শনিকদের ভাববিনিময় বিষয়েও রয়েছে আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন

সৈয়দ আবুল মকসুদ

প্রথমা প্রকাশন

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির মহত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা। তাঁর প্রধান পরিচয় কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হলেও বাঙালি জীবনের এমন কোনো দিক নেই যা তাঁর কর্ম ও চিন্তায় সমৃদ্ধতর হয়নি। প্রথাগত দার্শনিক তিনি নন, কিন্তু দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেও তাঁর অবদান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের দর্শন নিয়ে এর আগে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে। সৈয়দ আবুল মকসুদ এই বইয়ে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস ও দর্শনচিন্তার এমন কিছু দিক, যা অন্য কোনো বইয়ে আলোচিত হয়নি। ১৯টি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টি ও তাঁর মানবধর্মতত্ত্ব শুধু নয়, তাঁর দর্শনচিন্তায় বাংলার লোকজ মানবধর্ম ও সুফিবাদের প্রভাব এবং অন্যান্য প্রধান ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তাঁর অভিমতও। তাঁর সঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেল, বেনেদেত্তো ক্রোচেসহ দেশি-বিদেশি দার্শনিকদের ভাববিনিময় বিষয়েও রয়েছে আলোচনা ও বিশ্লেষণ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪২০, মে ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৯, জানুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৯০ টাকা

Rabindranather Dharmatatbwa O Darshan
[Theology and Philosophy of Rabindranath]
by Syed Abul Maksud
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 290 only

ISBN 978 984 90192 8 2

উৎসর্গ

সাজ্জাদ শরিফ
অনুজ প্রতিমেষু
দর্শন বিষয়ে যাঁর অসামান্য আগ্রহ

সূচিপত্র

প্রবেশক	৯
উপক্রমণিকা	১৩
রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব	২৫
ধর্মসাধনা	৩৩
বাউল ও লোকজ মানবধর্মের প্রভাব	৫৪
জীবনদেবতা	৬০
সাধনতত্ত্ব	৬৪
সুফিবাদে সিক্ত	৬৭
বৌদ্ধ মানবতাবাদ ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে	৭৫
মানবপন্থী বাংলাদেশ	৮১
মরমি মানবতাবাদ	৮৬
হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম'	৯২
রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	১০২
রবীন্দ্রনাথ-রাসেল সম্পর্ক	১০৮
রবীন্দ্রনাথ ও ক্রোচে	১১৭
রবীন্দ্র-বিশ্বদৃষ্টি : মানুষের ধর্ম	১২১
ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অভিমত	১৩৫
জাপানে দর্শন প্রচার ও প্রতিক্রিয়া	১৪৫
পারস্যে ভাববিনিময়	১৬১
উপসংহার	১৬৭
পরিশিষ্ট	১৭৩

প্রবেশক

এই ছোট বইটি আমার অনেক দিনের চিন্তার ফল। দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ করতে করতে এবং রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের ঘটনাপ্রবাহ, তাঁর চিন্তার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করে, তাঁর আধ্যাত্মিক ও ধর্মজীবন এবং তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে জানবার কৌতূহল হয়। তাঁর জীবন এক মহাজীবন। শুধু তাঁর সৃষ্টির বিপুলতার জন্য নয়, কাজের গুণের জন্যও নয়, সামগ্রিকভাবেই তাঁর কর্ম ও জীবনসাধনার তুলনা প্রাচ্যে বিশেষ নেই।

এর মধ্যে বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালে আমাকে একটি সেমিনারে 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন' সম্পর্কে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রবন্ধ পাঠ করি। আমার প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রবীণ অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, যিনি দর্শনবিষয়ক বহু বইয়ের লেখক এবং সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী।

একজন আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানসিক বিকাশ, তাঁর জীবনদর্শন ও ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতি এবং ধর্মসাধক হিসেবে তাঁর স্থান অতি ছোট পরিসরে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবু যেটুকু সম্ভব হয়েছে, এ বইয়ে সেটুকুই উপস্থাপন করা হলো। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও বিস্তারিতভাবে হবে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশি-বিদেশি দার্শনিকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা হলো, যা এর আগে এভাবে কোনো বইয়ে হয়নি।

বিভিন্ন সময় দর্শন নিয়ে কয়েকজন দেশি ও বিদেশি দার্শনিক ও দর্শনবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাঙালি দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং ব্রিটিশ দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল ও ইতালীয় দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা থাকল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময় ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, ইতালি, ইরান প্রভৃতি দেশ সফর করেছেন। সেসব দেশে তিনি একজন বিশিষ্ট ভারতীয় ভাবুকের মর্যাদা পেয়েছেন। সেখানকার চিন্তাশীল মানুষের সঙ্গে তিনি দার্শনিক তত্ত্বকথাই আলোচনা করেছেন বেশি—সাহিত্যসংক্রান্ত কথা কম। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সফর সম্পর্কে আলোচনা রইল।

রবীন্দ্রনাথকে তাঁর গান, নৃত্যনাট্য, গীতিকাব্য, নাটক বা কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাবে না। তাঁর ধর্মসাধনা ও জীবনদর্শন থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাঁর কবিতা, গান, নাটক প্রভৃতি উপভোগ করা এক জিনিস, কিন্তু তাঁর বাণী উপলব্ধি করার জন্যও তাঁর ধর্মসাধনা ও জীবনদর্শন আলোচনা করা প্রয়োজন। সে বিষয়টি বিবেচনা করেও রচিত এ বই।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন ও দর্শন নিয়ে লিখতে গেলে সুফিবাদ, মরমি ভাববাদ, বাংলার লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর ধর্মদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে হিন্দুধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তকদের সম্পর্কে তাঁর কী অভিমত তা জানা দরকার। এখানে সংক্ষেপে তা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখার রয়েছে অফুরন্ত বিষয় ও বিভিন্ন দিক। তাঁর বিচিত্র সত্তার যেকোনো একটিই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হতে পারে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে তাঁর অবদান অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আরও বেশি গুরুত্বসহ আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতির মধ্যে কোথাও আমি মোটা অক্ষর করেছি গুরুত্ব বোঝাতে। উদ্ধৃতির মধ্যে কোথাও কোথাও তৃতীয় বন্ধনীতে আমার মতামত দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে ২০০৪ সালে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত *রবীন্দ্র রচনাবলী* থেকে।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনার অসামান্য একাডেমিক গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া, আমরা একটি উদার, অসাম্প্রদায়িক ও পরমতসহিষ্ণু সমাজ গঠন করতে চাইলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও ধর্মসাধনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আমাকে আর সবকিছু বাদ দিয়ে লেখালেখির মধ্যেই নিয়োজিত থাকতে যাঁরা অব্যাহত চাপে রাখেন, তাঁদের দুজন হলেন *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আমার অনুজপ্রতিম সাজ্জাদ শরিফ। এ বইও প্রকাশিত হতে পারল তাঁদেরই আগ্রহে।

আমার বারবার কাটাকুটি ও বর্জন-সংযোজনের অত্যাচার সহাস্যে সহ্য করেছেন প্রথমা প্রকাশনের আমার প্রীতিভাজন কবি জাফর আহমদ রাশেদ ও হুমায়ুন কবীর। আমার অত্যাচার সহ্য করেছেন *প্রথম আলোর* কম্পিউটার বিভাগের দীপঙ্কর সাহা ও মো. আবুল ফজল বাদল। মো. ফারুক আহমেদ মেকাপ করেছেন অসামান্য যত্নে। তাঁদের জানাই ধন্যবাদ।

২০ নভেম্বর ২০১১ **সৈয়দ আবুল মকসুদ**

উপক্রমণিকা

এক

বাঙালি জাতির সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এবং জন্ম বাংলার সবচেয়ে আলোকিত ও সংস্কৃতিমান একটি পরিবারে। সমাজসংস্কার শুধু নয়, ওই সময় বাঙালির ভাব-আন্দোলন ও ধর্মান্দোলনও ছিল প্রবল ও খুবই প্রাণবন্ত। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দুটি ধারায়ই চলছিল ধর্মান্দোলন। রামমোহন রায় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কেউ কেউ উনিশ শতকের চিন্তা ও কর্মজগতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের সূচনা, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে উপদলীয় বিরোধ, তৃতীয় ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব, এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণমূলক তৎপরতা সমান্তরালভাবে চলছিল। এক দিকে বঙ্কিম-সমর্থকগণ, অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্প্রদায়—নবহিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে হিন্দু কলেজের হিন্দুধর্মবিরোধী অর্থহীন বাড়াবাড়ি, আধুনিক শিক্ষিতদের পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চা আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখে। উনিশ শতকের সবচেয়ে আধুনিক ও বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি কোনো ধর্মীয় মতাদর্শ নিয়ে তর্ক করে শক্তির অপচয় করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী ও সমাজসংস্কারক—তত্ত্ব নিয়ে শক্তিক্ষয় অপছন্দ করতেন, বেদান্ত দর্শনকে বলেছেন 'ভ্রান্ত দর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তিবাদ প্রচারে নিযুক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যরা ভক্তিবাদ ও কর্মবাদের সমন্বয় ঘটিয়ে

একটি বলিষ্ঠ হিন্দুসমাজ গঠনে ব্রতী হন। বঙ্গের পশ্চিমি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা এবং অদ্বৈত বেদান্ত, দ্বৈত বেদান্ত, বৈদিক সংহিতা, উপনিষদ, গীতার বাণী প্রভৃতি হিন্দুসমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে নবজাগরণ আনে। শতাব্দীর শেষার্ধে বেদান্ত ও গীতার বাণী বাঙালি হিন্দুসমাজকে আলোড়িত করেছিল। এসব ধর্মান্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা যুক্তিবাদী মন দিয়ে বিচার করে উপনিষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের বাণীটি আবিষ্কার করেন। তবে তাতে তিনি যোগ করেন নতুন মাত্রাও।

ভারতবর্ষে, জাপানে, আমেরিকায় কিংবা অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচারে, যা পরে *Religion of Man* ও *মানুষের ধর্ম* নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> The fact that one theme runs through all only proves to me that the Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not merely as philosophical subject. In fact, a very large portion of my writings, beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of this growth. Today I am made conscious of the fact that the works I have started and the words that I have uttered are deeply linked by a unity of inspiration whose proper definition has often remained unrevealed to me.

সৃষ্টিশীল প্রতিভা হিসেবে জগতের রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ে তাঁর মূল কারবার থাকলেও 'অনন্ত অসীম সকল সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ যে ব্রহ্ম' এই জগতের মূলে, তাঁর রহস্য উদ্‌ঘাটনেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না কোনো দিনই। ব্রহ্মকে জানবার চেষ্টা করেছেন এবং সাধনা করেছেন তাঁর নৈকট্য ও করুণা লাভের। তাঁর সেই সাধনার ফলই তাঁর দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বহুবার বলেছেন তিনি মূলত কবি। তাঁর কবিতা ও গান দিয়েই তিনি বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন। যদিও সাহিত্যের এমন কোনো শাখা ও বিষয় নেই যেখানে তাঁর কোনো কাজ নেই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের কাছে তাঁর কাব্য ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখার আবেদন ততটা না হওয়াই স্বাভাবিক যতটা আমাদের কাছে। জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাসের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের সুর একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। তাঁকে বলেছিলাম, আপনার কাছে যা একঘেয়ে, আমাদের কাছে তা চির-অভিনব, এবং আপনার কাছে যা ক্লান্তিকর, আমাদের কাছে তা পরম প্রশান্তিকর ও শান্তিদায়ক। তা ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের বাণীর অনর্ঘতা গুন্টার গ্রাসের মতো

কোনো বিদগ্ধ বিদেশির পক্ষেও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কোনো ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যায়—শব্দটির ভাব ও ঝঙ্কার অর্থাৎ অর্থের সূক্ষ্মতা অনুবাদ করা সম্ভব নয়। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান আগের মতো আজও ভিন্নদেশি পাঠকদের মুগ্ধ করে না, যতটা করে তাঁর চিন্তাশীল প্রবন্ধ ও অন্য রচনা।

ইউরোপের যাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে, দেখেছি, সকলেই রবীন্দ্রনাথকে একজন ভাবুক হিসেবেই বেশি মূল্য দেন, যদিও তাঁরা জানেন যে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি এবং কবিতার জন্যই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। বার্লিনের ফ্রি ইউনিভার্সিটির 'ফিলসফি ইনস্টিটিউট'-এর বিশ্লেষণী দর্শনের অধ্যাপিকা মার্গারিটা ফন ব্রেনতানো আমার কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক ফিলসফির প্রভাব আজ কতটা ভারতের সমাজে অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে। তাঁকে বলেছিলাম, বাঙালি তাঁকে ফিলসফার হিসেবে আলাদা করে দেখে না, তাঁর কাব্য ও সাহিত্যই বাঙালির প্রতিদিনের সঙ্গী। লক্ষ করেছি, রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী বা আধ্যাত্মিক রচনা পাশ্চাত্যের একশ্রেণীর মানুষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। পাশ্চাত্যে আধুনিক 'দার্শনিক' বলতে যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর দর্শনবিদ নন, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা সংঘাতময় পৃথিবীতে গুরুত্বহীন নয় বলে পশ্চিমের অনেকে মনে করেন। যদিও পশ্চিমে তাঁর রচনা বহুপঠিত নয়। তাঁর চেয়ে পশ্চিমের পাঠক ভারতের অন্য লেখকের বই বরং বেশি পড়েন।

শুধু পশ্চিমে নয়, প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির কাছেও তাঁর কবিতার চেয়ে তাঁর মানবতাবাদী চিন্তার মূল্যই বেশি। তিনি এশিয়ার দুটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশ—জাপান ও চীন—সফর করেন। জাপানি রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ কাজুও আজুমার সঙ্গে আমার কয়েকবার দীর্ঘ কথা হয়েছিল। তিনি জানান, ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জাপান সফরে যান, তাঁকে জাপানের শিক্ষিতসমাজ 'ভারতের কবিঋষি' বলেই উল্লেখ করেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জীবনদর্শনের কথাই শুনতে চান। অন্যদিকে তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ জানতে চান বৌদ্ধ ও অন্যান্য জাপানি দর্শনের নানা বিষয় সম্পর্কে। আজুমা জানান, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী বাণী সেদিন জাপানিদের মনঃপূত হয়নি; বরং তাঁরা তাঁর যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য অগ্রাহ্য শুধু নয় তার বিরোধিতাই করেন। কারণ, জাপান তখন ছিল একটি সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি।

রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও চিন্তাধারা নিয়ে আমার উপমহাদেশের বাইরে তেহরান, সাংহাই, বার্লিন ও লন্ডনে বিদ্বানদের মধ্যে বিভিন্ন সময় কিছু কথা বলার সুযোগ আমার হয়েছিল। বেইজিং ও সাংহাইতে লক্ষ করেছি, চীনারা তাঁর কবিতা ও সাহিত্যকে মূল্য দেন। ইরান ও ইউরোপে যাঁদের সঙ্গে কথা হয়েছে, দেখেছি, সকলেই রবীন্দ্রনাথকে একজন ভাবুক হিসেবেই বিবেচনা করেন।

ভারতেও অনেকবার সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে শুনেছি এবং কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। সেসব আলোচনায় যা বলেছি, তার কিছু কথা এ বইয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিষয়ে অনেকগুলো বই—বাংলা ও ইংরেজিতে—এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সেসবের লেখকদের মধ্যে অবাঙালিও আছেন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের মতো বড় দর্শনতত্ত্ববিদও রয়েছেন। লক্ষ করেছি, সেগুলোর আলোচ্য বিষয়ে একটির সঙ্গে আরেকটির পার্থক্য বিশেষ নেই। বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের দিক থেকে আমার এ বই সেগুলো থেকে উন্নত না হলেও অনেকটাই ভিন্ন।

দুই

রবীন্দ্রনাথের কোনো দার্শনিক আকরগ্রন্থ নেই। তাঁর কবিতা-গান ও বিপুল-বিচিত্র গদ্যরচনায় এবং বক্তৃতা ও চিঠিপত্রে তাঁর দার্শনিক ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোকে কুড়িয়ে এবং গুছিয়ে এক জায়গায় গোছগাছ করে রেখে যাননি তিনি বা দেননি কোনো অখণ্ড রূপ। তার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেননি। অন্য কোনো লেখক বা দর্শনবেত্তাও যে সে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা-ও নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন মহাসভায় সভাপতির অভিভাষণে, বার্লিনে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতায়, জাপানে, আমেরিকায় কিংবা অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচারে, যা পরে *Religion of Man* ও *মানুষের ধর্ম* নামে প্রকাশিত হয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে উঠে আসেনি। তবে মূল কথাটি বলা হয়েছে। তাঁর দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর কবিতাসহ অন্যান্য রচনারও সাহায্য নেওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন মানবতাবাদী মরমি দর্শন—তাঁর ধর্মবিশ্বাস-নির্ভর ব্যক্তিগত মরমি ধর্ম। বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে তা অনেকরকমভাবেই

করা সম্ভব। যুক্তি দিয়ে তাঁর ধর্মমত ও দর্শনের বিচার করতে গেলে অনেক কিছু অসার ও স্রেফ ভাবালুতা বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একটি সংঘাতহীন শান্তিপূর্ণ ও সুখী মানবসমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে তার প্রয়োজন অসামান্য। সেখানেই তাঁর ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন অমূল্য। আমি সেই দিক থেকেই তাঁর চিন্তাকে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করেছি, তত্ত্ববিচার ও বিশ্লেষণী দর্শনের মাপকাঠিতে নয়। মহাজগতের সত্য ও মানবজীবনের গভীরতম রহস্য যাঁরা সন্ধান করেন তাঁরাই যদি দার্শনিক অভিধায় আখ্যায়িত হন, তাহলে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ একজন বড় দার্শনিক, কারণ তিনিও আমৃত্যু জীবনের গভীর রহস্য ও সত্যের সন্ধান করেছেন। আধুনিক মানুষের সব সমস্যার সমাধান তাঁর দর্শনে নেই, কিন্তু তাতে তাঁর ধর্মচিন্তা ও দর্শনের গুরুত্ব কমে যায় না।

তিন

বসন্তকুমার লাল তাঁর *Contemporary Indian Philosophy* গ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় দার্শনিক হিসেবে যাঁদের আলোচনা করেছেন তাঁরা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন এবং মুহম্মদ ইকবাল। ইকবাল ছাড়া অন্য ছয়জনই হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং তাঁরা বেদান্ত অনুসারী দার্শনিক। ইসলামধর্মাবলম্বী ইকবালের দর্শন মুসলিম দর্শনের অন্তর্গত। রাধাকৃষ্ণন ভারতীয় দর্শনে পণ্ডিত, কিন্তু কোনো বড় মৌলিক প্রতিভা নন। তৎকালীন কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত ভি. ব্রোদোভ রচিত *Indian Philosophy in Modern Time*-এ শুধু ভারতীয় তত্ত্ব-দর্শন নয়, সমকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-রাজনৈতিক দর্শনও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে উনিশ ও কুড়ি শতকের ভারতের ভাববাদী ও সামন্তবাদী সমাজের তত্ত্ব-দর্শন ও সমাজ-দর্শন দুই-ই আলোচনা করা হয়েছে। তাতে আছেন রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেনরি ডিরোজিও, দয়ানন্দ সরস্বতী, সৈয়দ আহমদ খান, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, বাল গঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ রাজনৈতিক-সামাজিক দর্শনের আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন।

পশ্চিমের প্রাতিষ্ঠানিক দর্শনচর্চায় প্রাচ্য তথা ভারতীয় উপমহাদেশের দর্শনের স্বীকৃতি নেই, ভারতীয় দর্শনকে তাঁরা আলাদাভাবে আলোচনা করেন। পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় ষড়-দর্শনকে অস্বীকার করা যাবে না।

তবে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে পশ্চিমের দার্শনিকদের যে অভিযোগ, তা-ও বিবেচনার দাবি রাখে। দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা ফ্রাঙ্ক থিলি তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন *দর্শনের ইতিহাস*, সেখানে পৃথিবীর সব জাতির দর্শনের ইতিহাসই প্রত্যাশিত, কিন্তু তাতে প্রাচ্য দর্শনের ইতিহাস নেই—আছে শুধু পাশ্চাত্যের দর্শনের ইতিহাস। ভারতীয়, চৈনিক, জাপানি, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের দর্শনের ইতিহাস নেই। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, প্রাচ্য জাতিগুলো তাদের দর্শনচিন্তার চর্চায় খুব অল্প ক্ষেত্রেই একটি সিস্টেম বা পদ্ধতি তৈরি করতে পেরেছে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে প্রাচ্যের দার্শনিক চিন্তা কাব্য ও বিশ্বাসের উপাদানে পরিপূর্ণ। অবশ্যই ব্যতিক্রম কিছু আছে। তবে তা ব্যতিক্রম হিসেবেই বিবেচ্য। আমরা জানি, ইউরোপের মধ্যযুগের দর্শনও ধর্মভিত্তিক—খ্রিষ্টধর্ম-বিশ্বাসনির্ভর।

পশ্চিমে দর্শনের ইতিহাস লিখে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে খ্যাতি পেয়েছেন যাঁরা তাঁদের একজন ডবলিউ টি স্টেস। তিনি তাঁর *A Critical History of Greek Philosophy* (New York, 1967)-তেও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে বলেছেন যে এই দর্শন যতটা না তত্ত্বদর্শন বা মেটাফিজিক্যাল তার চেয়ে বেশি ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মদর্শন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এ-জাতীয় ঢালাও অভিযোগ আমরা বিনা তর্কে মানতে বাধ্য নই। তবে স্টেস ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আর যে কথাটি বলেছেন তাও স্বীকার করা যায় না। তিনি বলেছেন, ভারতীয় তত্ত্বদর্শন মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের চিন্তাধারায় বিশেষ অবদান রাখেনি, বরং তার বাইরে বিচ্ছিন্ন ও স্থবির একটি ধারা হিসেবেই প্রবহমান থেকে গেছে। এই মতামতও একদেশদর্শী। মানবসভ্যতা নির্মাণে ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা অস্বীকার করা কি সম্ভব? কারণ মানবসভ্যতা বলতে শুধু ইউরোপীয় সভ্যতাও বোঝায় না। ভারতীয় সভ্যতাও মানবসভ্যতারই অংশ।

ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতার একটি। ভারতীয় সভ্যতায় ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা থাকবেই। বিশ্বসভ্যতার একটি পর্যায়ে ভারতীয় দর্শনগুলো অসামান্য ভূমিকা রাখে, কিন্তু ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাতে আসে স্থবিরতা। খ্রিষ্টের জন্মের হাজার বছর আগে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বেদান্ত, চার্বাক ও বৌদ্ধদর্শন মানবজ্ঞানের ইতিহাসে অমূল্য অবদান রাখে। শত শত বছর ধরে উপমহাদেশে অনুশীলন করা হয়েছে বৌদ্ধ, বেদান্ত, চার্বাক, জৈন, সাংখ্য, বৈশেষিক, মীমাংসা, যোগ, ন্যায়, নব্য-ন্যায় প্রভৃতি। এটাও সত্য যে প্রাচীনকালের পর ভারতে দর্শনের শুধু টীকা-ভাষ্য লেখা হয়েছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, নতুন মৌলিক দর্শনের জন্ম হয়নি। এই যে একটি

জায়গায় এসে থেমে থাকা এবং একই জিনিসের শুধু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পুনর্ব্যাখ্যা করা, তা রবীন্দ্রনাথেরও ভালো লাগেনি। তাই তিনি সেদিকে যাননি। উপনিষদ ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলো তাঁকে আকর্ষণ করেনি। কারণ, পশ্চিমিরা যথার্থই বলেন, ভারতীয় দর্শনে কোনো অগ্রসরমাণতা বা প্রগতিশীলতা নেই।

প্রথম দিকে বেদান্তদর্শন রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তিনি লক্ষ করেন যে সেই হাজার বছর আগে শঙ্কর এবং রামানুজ যে ভাষ্য তৈরি করে গেছেন তাঁদের পর তা আর বেশি এগোয়নি। সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন ঠিকই বলেছেন, অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে বৈদান্তিক দার্শনিক বিতর্ক একটি স্কলাস্টিক বা ধর্মশাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়। যুক্তির চেয়ে বিশ্বাস প্রাধান্য পায়। ফলে, সৃষ্টিশীল দর্শনচর্চার পথ বন্ধ হয়ে যায়। শাস্ত্রের বিপরীতে কেউ সমালোচনামূলক তত্ত্ব উপস্থাপন করলে তা Impiety and sacrilege—অধার্মিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হতে থাকে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বগুলোকে সর্বকালের জন্য অপরিবর্তনীয় বলে বিবেচনা করা হতে থাকে। তাতে দর্শনচর্চার রাস্তাটির সামনে দেয়াল উঠে যায়—কোনো নতুন দার্শনিকের এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয় দর্শন আর বিকশিত হয়নি হাজার বছরে। রবীন্দ্রনাথ ওই ধারার দর্শনচর্চা থেকে সরে যান।

চার

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত *রবীন্দ্রদর্শন* (১৩৭৫) নামের এক বইয়ের মুখবন্ধে বিশ্বভারতীর উপাচার্য দর্শনবিদ কালিদাস ভট্টাচার্য (১৯১১-১৯৮৪) লিখেছিলেন :

> সংকীর্ণ অর্থে রবীন্দ্রনাথ একদিক থেকে মাত্র আধা-দার্শনিক, অন্যদিক থেকে একেবারে অ-দার্শনিক। তাঁর কাব্যগ্রন্থাদিতে কোথাও তিনি অনুভূত তত্ত্বাদির শাস্ত্রসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ করেননি, যুক্তি-তর্কের অবতারণা আদৌ করেননি, কেবল অনবদ্য রসাত্মক বাক্যে সেগুলি অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ করে গেছেন। অন্যদিকে আবার 'Sadhana', 'Religion of Man' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকীর্ণ দার্শনিকের মতো কিছুটা বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু স্পষ্টই বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে গৌণ, তত্ত্ব-অধিকারের অঙ্গীভূত। বিচার-

বিশ্লেষণের প্রাধান্য সেখানে নেই। সংকীর্ণ অর্থে দার্শনিকরা কিন্তু বিচারাদিরই প্রাধান্য দেন।

'দার্শনিক' শব্দের সংকীর্ণতর অর্থে কেবল তাঁরাই দার্শনিক যাঁদের তত্ত্ব আবিষ্কারের, তত্ত্বোপলব্ধির কোনো বালাই নেই। এঁরা কেবল বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ও তুলনামূলক আলোচনা করেন। এঁদের গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে ক্ষুরধার বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বহু দার্শনিক মতবাদ এঁরা একেবারে নস্যাৎ করে দেন, অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে এঁরা কয়েকটি মতবাদকে নিছক সত্য রূপে তুলে ধরতে পারেন, প্রয়োজন হলে এঁরা অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক সমগ্র তত্ত্বরাজ্যটিকেই ধূলিসাৎ করে দেন। কিন্তু এঁদের চিন্তাধারা উপলব্ধির মহিমায় মহিমান্বিত নয়। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথকে কেউই দার্শনিক বলবেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই অর্থে দার্শনিক হতে চাইবেন না।

ভারতীয় দর্শনের মূল কথা 'আত্মদর্শন' বা philosophy of soul-sight; পাশ্চাত্যদর্শনের মূলকথা সত্যানুসন্ধান। দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান অনুশীলন আর জীবনে তা গ্রহণ—এক কথা নয়। প্রাচ্যে তিনিই দার্শনিক, যিনি তত্ত্বজ্ঞানকে আলোচনা ও চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আপন সত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন। বহু বাঙালি পণ্ডিত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিপুল জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁদের দর্শনচর্চা চিন্তার স্তরে থাকায় তাঁরা ভারতীয় আদর্শে 'দার্শনিক' নন।

নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মসাধনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন করেছেন, কিন্তু শৃঙ্খলার সঙ্গে দর্শনচর্চা করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে; কারণ, তিনি মূলত কবি ও শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দার্শনিক বলে দাবিও করেননি। তিনি একবার সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন :

> ...আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই।... কিন্তু শুধু কবি বললেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের এবং তাঁর সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। **আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে**। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বারবার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। এই মানুষ ব্যক্তিতে এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শনতত্ত্ববিদ বা মেটাফিজিশিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা ঋষিপ্রতিম, তবে ঋষিও নন—বাস্তববাদী মানুষ। দার্শনিক এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষির মধ্যে বিরাট ব্যবধান। দার্শনিকের কাজ চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ। সত্যদ্রষ্টার কাজ সত্য উপলব্ধির জন্য নিরন্তর সাধনা করে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মহাসাধক।

পাঁচ

শচীন সেন নামের এক লেখক ১৯২৯ সালে প্রকাশ করেছিলেন *Political Philosophy of Rabindranath* নামে এক বই। তাঁর 'রাষ্ট্রনৈতিক মত কোনো পাঠকের কাছে কী রকম প্রতীয়মান হয়েছে তা জানবার কৌতূহল সামলাতে' না পেরে রবীন্দ্রনাথ বইটি পড়েন। পড়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি এতটাই অসন্তুষ্ট হন যে, একটি প্রবন্ধই লিখে ফেলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন :

> বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে; প্রত্যক্ষ না থাকলেও তাদের প্রণোদনা থেকে যায়। আমাদের ব্রাহ্মপরিবার আধুনিক হিন্দু-সমাজের বাহ্য আচারবিচার ক্রিয়াকর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সেই গৌরববোধ সেদিন নানা আকারে আমাদের বাড়ির অন্তঃপ্রকৃতি ও বাইরের ব্যবহারকে অধিকার করেছে। তখনকার দিনে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের প্রতি যাঁদের আস্থা বিচলিত হত, তাঁদের মনকে হয় য়ুরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ ছাঁদের নাস্তিকতা অথবা খৃস্টানধর্মপ্রবণতা পেয়ে বসত। কিন্তু এ কথা সকলের জানা যে, সে কালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।
>
> বলা বাহুল্য, বাল্যকালে স্বভাবতই সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।
>
> সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ বিকাশ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে থেকেই।
>
> ['রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত', *কালান্তর*]

ওই লেখায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, উনিশ শতকের শেষ ও কুড়ি শতকের প্রথম দশকের রাজনীতিতে তাঁর অংশগ্রহণ এবং সেকালের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার আলোচনা করেছেন; তাঁর আধ্যাত্মিক ও ধর্মজীবনের কথা নয়। কিন্তু তা থেকে একটি জিনিস জানা যায়, তা হলো, তাঁর 'জীবনপথে' 'বালককালে' তাঁদের উদার 'ব্রাহ্মপরিবার' থেকে যে প্রণোদনা পেয়েছিলেন, তা তাঁর জীবনে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিল। তাঁদের পরিবারের পূর্বপুরুষেরা—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অন্য কোনো দেশ নয়, 'ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ' করেছেন 'ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ' থেকে। কিন্তু তাঁর মন কোনো সংঘবদ্ধ মনের একটি

ভগ্নাংশ ছিল না, তাঁর শৈশবের পরিবেশ তাঁর 'মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত' করেছিল। তাঁর ধর্মজীবন ও ধর্মতত্ত্ব ছিল বিশেষভাবে তাঁরই নিজস্ব, কোনো ছকে বাঁধা নয়। বালককাল থেকেই তিনি বাড়ির অন্য সবার মতো ছিলেন না, ছিলেন বিশেষ ও স্বতন্ত্র।

তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন যেমনই হোক, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল পরিচয় সম্পর্কে অতি সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

> একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।...শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপ স্খালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি—যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুই ধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।
>
> ['আত্মপরিচয়'-৪]

মানুষকে ধর্মের পথে আনতে 'শুভ্র নিরঞ্জনে'র দূত হিসেবে যাঁরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, মানুষের কল্যাণব্রত পালন করেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে তাঁদের একজন নন বলে ঘোষণা করেন। মানুষের নিত্যদিনের আনন্দবেদনা, হাসিকান্না প্রভৃতি বিচিত্র লীলাকে লীলায়িত করার ব্রত তাঁর। অর্থাৎ তিনি কোনো ধর্মগুরু বা কর্মযোগী নন, তিনি জীবনরসের রসিক মাত্র। সত্যের সন্ধান তিনি করেন না তা নয়, কিন্তু সুন্দরের সাধনাই তাঁর প্রধান কাজ। তিনি বলেছেন, 'পথের প্রান্তে তীর্থ মোর নয়,/ পথের দু'ধারে আছে মোর দেবালয়।' তবে সৌন্দর্যপূজারি ও ভাবযোগী হলেও তিনি ছিলেন একজন সমাজসজ্ঞান ও রাজনীতিসচেতন দায়িত্বশীল মানুষ। 'পথিকদের চলার সঙ্গে চলার' সাথে

সাথে যাত্রাটি যেন আনন্দময় ও নিরুপদ্রব হয়, সে চেষ্টাও ছিল তাঁর। সেখানেই অন্যান্য পথিকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

বিভিন্ন দেশের, নানা জাতির ভাবুকদের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বোঝার চেষ্টা করেছেন। যেখানে যা ভালো তা গ্রহণে তাঁর সংকোচ ছিল না। তিনি world spirit বা বিশ্ব-আত্মাকে ধারণ করেছিলেন—তাঁর আগে আর কোনো বাঙালি তা অতটা করেননি।

সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে এক সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ দেন তাতে তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন :

> অনেক দিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিষ ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগতকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে—আমি কামনা করেছি মুক্তিকে যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে—আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি অবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন *নরদেবতা*, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।
>
> ['আত্মপরিচয়']

যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি দীর্ঘদিন বন্দী থাকেননি—ব্রাহ্মসমাজ থেকে কোনো ঘোষণা দিয়ে নয়, নিঃশব্দে সরে আসেন। অবিলম্বেই তিনি উপলব্ধি করেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পসাহিত্যে যেমন ধর্মমতেও তেমনি, যা গোষ্ঠীগত তার মূল্য সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে এটা পরস্পর অনুকরণের সংক্রামকতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

[*The Religion of Man*]

রবীন্দ্রনাথ মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রতিভা। যেকোনো ব্যাপারেই অনুকরণ তাঁর অপছন্দ। তবে কোথাও ভালো কিছু দেখলে তা অনুসরণ করতে তাঁর আপত্তি

ছিল না। কিন্তু ধর্মচর্চাই হোক আর যেকোনো ব্যাপারেই হোক, অন্ধের মতো অনুকরণ করায় ছিল তাঁর অশেষ অরুচি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার বাইরে আর যে সাধনা তা তাঁর আত্মমুক্তির সাধনা। 'পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে' তাঁর পরম প্রশান্তি। কিন্তু প্রথার কাছে, প্রতিষ্ঠিত সংস্কারের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। রাজনৈতিক হোক, ধর্মীয় হোক, সামাজিক হোক—যেকোনো প্রতিষ্ঠিত নীতির চেয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যকে বড় করে দেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তবে তাতে সীমাবদ্ধতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। তাঁর দর্শন ও ধর্মসাধনার অসামান্য গুরুত্ব এখানে যে, তা একই সঙ্গে একজনকে অতিন্দ্রীয়বাদী ও মানবতাবাদী হতে সাহায্য করে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ও সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠার সহায়ক। পৃথিবীতে নাস্তিক মানবতাবাদী-শান্তিবাদীও আছেন অনেকে, যেমন বারট্র্যান্ড রাসেল ও জাঁ-পল সার্ত্রে। আমাদের প্রাচ্যের সমাজে নিরীশ্বরবাদ জনপ্রিয় নয়। রবীন্দ্রনাথের দর্শন-ধর্মচিন্তা অনুশীলন করলে ব্যক্তি ও সমাজের কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বিশেষ করে আজকের সংঘাতময় ও হিংসাকবলিত পৃথিবীতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেখানেই রবীন্দ্রদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব চর্চার গুরুত্ব।

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মজীবন, ধর্মসাধনা ও তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁর সাধক পিতার ধর্মসাধনা ও জীবনদর্শন আলোচনা করতেই হবে। কারণ, তিনি বেড়ে উঠেছিলেন তাঁর পিতার ছায়ায়, প্রভাবিত হয়েছিলেন পিতার আধ্যাত্মিক শিক্ষায় এবং তাঁর ধর্মজীবন ও জীবনদর্শন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই (১৮১৭-১৯০৫) ধর্মসাধনার আরও সম্প্রসারিত ও পরিশীলিত রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ করেছিলেন তাঁর নিজেরও ধ্যানধারণা ও উপলব্ধিজাত উপাদান।

দেবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ ও সক্রিয় জীবন অতিবাহিত হয় উনিশ শতকে। উনিশ শতকের উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন ছিল কুড়ি শতকের চেয়ে একেবারেই আলাদা। দুই শতকের চরিত্রের মধ্যে ব্যবধান যেন হাজার বছরের। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন ও তার বিরুদ্ধে উত্তাল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হওয়ার অব্যবহিত আগে দেবেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে। রাজনীতি হয়ে উঠল সংঘাতময়। একটি নতুন ধারাও দেখা দিল রাজনীতিতে: সন্ত্রাসবাদ। রবীন্দ্রনাথ অল্প সময় ওই উত্তাল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পর বাংলাদেশ ও উপমহাদেশ আর আগের মতো রইল না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশিই রইল, কিন্তু মনের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের চোখেই প্রথম এই আত্মঘাতী বিষয়টি ধরা পড়ে। তাঁর সমন্বয়বাদী চিন্তাধারার মূল্য ছিল না ওই ধারার রাজনীতির নেতাদের কাছে। নিজের অবস্থান বুঝতে পেরে তিনিই স্বেচ্ছায় সরে যান তাঁদের কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের ৮০ বছরের জীবন দুভাগে বিভক্ত: প্রথম চল্লিশ বছর কেটেছে উনিশ শতকে, শেষ চল্লিশ বছর কুড়ি শতকে। উনিশ শতকের শেষ দিকের হিন্দুত্বের পুনর্জাগরণে তাঁর পরিবারের অন্যদের সঙ্গে তিনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়, "'হিন্দুমেলা'র পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ির সকলে তখন উৎসাহিত"। কুড়ি শতকে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশবিরোধী আন্দোলনে মূলত শ্রেণীস্বার্থ থেকে ও অন্যদের প্ররোচনায় প্রথম দিকে কয়েক মাস সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু পরে নিজেকে সরিয়ে নেন আন্দোলনটি থেকে, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতায় রূপ নেওয়ার কারণে। ওই আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার তাৎপর্য তখন তাঁর সম্প্রদায়ের কেউ অনুধাবন করেননি।

কুড়ি শতকে তিনি দেখেছেন ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, সেই আন্দোলনের দুর্বলতা, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, গান্ধীর জাতীয়তাবাদী অসহযোগ আন্দোলন (যে আন্দোলনের দুর্বলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি), কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ এবং বিশ্ব ঘুরে দেখেছেন বেদনাদায়ক সংঘাতময় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। পরিবারে পিতার শিক্ষা ও দীক্ষা এবং ঘরের ও বাইরের এ সবকিছু তাঁর ধর্মজীবন ও জীবনদর্শন গঠন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেড়ে ওঠেন শুধু তাঁদের পারিবারিক মরমি ও অধ্যাত্মবাদী-ভাববাদী নয়, যুক্তিবাদী আবহাওয়ায়ও। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৯৮৬) ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ও সহকর্মী। কিন্তু যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু অক্ষয়কুমার এবং অধ্যাত্মবাদী দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর মানুষ। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়:

> ...আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ পাতাল প্রভেদ।
>
> [*আত্মজীবনী*]

বিপরীত চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও সমাজসংস্কারে ও আধুনিক সংস্কৃতি নির্মাণে তাঁরা একত্রে কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ওই দুই ধারা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে এ কথাও মনে করার কারণ নেই যে, অধ্যাত্মবাদী হলেও দেবেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানবিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাবার থেকে অধ্যাত্মবাদ এবং অক্ষয়কুমার থেকে পেয়েছিলেন যুক্তিবাদিতা ও বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষা। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা যথেষ্টই মূল্যবান।

বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পুস্তিকা রয়েছে দেবেন্দ্রনাথের। তাঁর আত্মজীবনী

তাঁর মর্মলোকের বাণী—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর মরমি ভাবনা ও ঈশ্বর-উপলব্ধি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও ধারণার প্রকাশ। তিনি আজীবন সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ-সন্ধান করেছেন ঐকান্তিকতায়—নিরাসক্ত ঋষির মতো, যদিও সাংসারিক জীবনে ছিলেন খুবই বৈষয়িক। ব্রহ্মার বিচিত্র ক্ষমতার অপার মহিমায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। তাঁর জীবনের ঘটনাবলি নয়, তাঁর সময়ের ইতিহাস নয়, বরং তাঁর মরমি মনের ধ্যান-ধারণার প্রকাশ তাঁর আত্মজীবনী। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, তাঁর পিতৃদেবের 'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে, তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।' [*জীবনস্মৃতি*]

আর কেউ নন, দেবেন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

> ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নূতন নূতন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে; যা রয়েছে তোমার চারিদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।
>
> ['আত্মপরিচয়']

অদ্বৈতবাদী দেবেন্দ্রনাথের অবিচল বিশ্বাস : এই জগৎ ব্রহ্মার। জগতের সর্বত্র স্রষ্টা বিরাজমান। তিনি তাঁর সর্বেশ্বরবাদী ধারণা প্রকাশ করে প্রার্থনার ভাষায় বলেছেন :

> হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র 'প্রকাশ' করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ।
>
> [*আত্মজীবনী*]

এ কথা রবীন্দ্রনাথেরও। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ছিল ব্রহ্মার এই সৃষ্টিকে নিয়ে সীমাহীন বিস্ময় ও কৌতূহল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন এই ভাষায় :

> সহসা হৃদপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।
>
> [*আত্মজীবনী*]

এই বিবৃতিতে কিছুমাত্র অসত্য নেই, অতিরঞ্জন নেই। ভক্তের হৃদয়ে এমনটিই ঘটা স্বাভাবিক। অবশ্য এ কথা কোনো পদার্থবিজ্ঞানী ও বস্তুবাদী বিশ্বাস না করলেও বলার কিছু নেই; কিন্তু অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদীর কাছে, ভক্তের কাছে, ঈশ্বরপ্রেমিকের কাছে, এ এক মহাসত্য। এ হলো একজন

আধ্যাত্মিক সাধকের গভীর উপলব্ধি। পুরাকালে নবীদের কাছেও ওইভাবেই দেখা দিয়েছেন স্রষ্টা।

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর ও মানবাত্মার সম্পর্ক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটা সম্ভব। এই মাটির পৃথিবী থেকে যেজন তাঁকে গভীর ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ডাকে, তার ডাকে তিনি সাড়া দেন। তিনি বলেন :

> এই সমাজ হইতে যেরূপ ঈশ্বরের বিমলস্তুতিবাদ ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার তিনিও এই সমাজ-মন্দিরে চতুর্দ্দিক হইতে অমৃত-ধারা বর্ষণ করেন।
>
> [ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ১৮৬১]

এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথও আজীবন পোষণ করতেন। আমরা শুধু এইটুকু প্রশ্ন করতে পারি—তাঁর 'অমৃত-ধারা' কি সর্বদাই বর্ষিত হয় মানবের 'সমাজ-মন্দিরে'। বরং মানুষের ভালো-মন্দে, কল্যাণ-অকল্যাণে, সুখে-দুঃখে তাঁর উদাসীনতার পরিচয়ই সব সময় লক্ষ করা যায়। জগতের অধিকাংশ মানুষই তাঁর 'অমৃত-ধারা' থেকে বঞ্চিত, তাদের দুঃখ-কষ্টের শেষ নেই।

অন্যদিকে অক্ষয়কুমার যুক্তির বাইরে যেতে চাইতেন না, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রচলিত বিশ্বাসেই অনড় ছিলেন। কিছু কিছু প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে নয়, অক্ষয়কুমারকেই অভ্রান্ত মনে করতেন। কিন্তু বাবার মতের সরাসরি ও প্রকাশ্য বিরোধিতায় তিনি যাননি ভক্তিবশত। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> অক্ষয়কুমারের বিচারবুদ্ধিতে বেদ অভ্রান্ত হতে পারে না, অপৌরুষেয় তো নয়ই। দেবেন্দ্রনাথ বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে চিরাচরিত মতই পোষণ করতেন; ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হেতু পরম্পরাগত বিশ্বাসের বশীভূত হয়েই ভাবতেন, বেদবাক্য মান্য ও প্রামাণিক। ইংরেজিতে যে তর্ক চলছিল তাতে তিনি বেদান্তকে revealation বা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলে দাবি করেন।
>
> [*রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*]

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদ হলো : সে সব অপৌরুষেয়—ঈশ্বরপ্রেরিত। ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নাকি মানুষের রচনা—বেদসম্পর্কে সে বিতর্কে যাননি রবীন্দ্রনাথ। সে বিতর্কে গেলে বাবার মতের ও তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই যেতে হতো। বেদ-বেদান্তের অনর্ঘ বাণীকেই তিনি চিরকালের সত্য বলে গ্রহণ করেন। বেদের শ্লোকগুলো যে মানুষেরই রচনা, অতি উঁচু চিন্তাশীল ঋষি বা মহাপুরুষদের রচিত ও সংকলিত, তাতে রবীন্দ্রনাথের কোনো সন্দেহ ছিল না, তবে তা নিয়ে তর্কেও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। রবীন্দ্রসান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাঁর জীবনীকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'য় বলেন :

> বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। নৈয়ায়িকরা বলেন, বেদ ঈশ্বরের সৃষ্টি;

> মীমাংসকরা বলেন, বেদসমূহ স্বয়ংপ্রকাশ, কোনো প্রাকৃত বা সাধারণ পুরুষের সৃষ্টি নয়—অর্থাৎ, বেদ অপৌরুষেয়। কিন্তু বেদ খুললেই দেখা যায় মন্ত্র-রচয়িতাদের নাম স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত।
>
> [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, একই সূত্র, পৃ.১৬০]

ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক যে পরিবার সেখানেও আশৈশব রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ধর্মীয় আবহওয়ায় বেড়ে ওঠেন। তা সনাতন হিন্দুধর্মও নয় বা অন্য কোনো প্রচলিত ধর্মও নয়। তবে বৈদিক বিশ্বাস ও হিন্দুসংস্কৃতিরই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধারক, যদিও তাতে ইসলামি একেশ্বরবাদী উপাদানও যথেষ্টই ছিল। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে আশৈশব রামমোহনের ধর্মনীতির প্রভাব ছিল ঠাকুর-পরিবারে গভীর। রামমোহনের ধর্মনীতি গড়ে উঠেছিল হিন্দু-ইসলাম-খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সমন্বয়ে। তবে তার শেকড় ছিল ভারতের মাটিতে, অন্য কোথাও নয়। ভারতীয় ধর্মগুলো ভারতেরই মৃত্তিকাজাত জিনিস। ভারতবর্ষের মানুষের ধর্মানুভূতি ভারতের মাটি থেকেই আহরণ করা বাঞ্ছনীয়, অন্য কোনো দেশ থেকে নয়, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো দ্বিধা ছিল না। রামমোহনের ওপর তাঁর আস্থা ও ভক্তি ছিল অপার। মাত্র ২৩ বছর বয়সে রামমোহন সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> তিনি এত ভাষা জানিতেন, এত ধর্ম আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকল ধর্মের সত্যের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, তিনি তো বিদেশ হইতে অনায়াসে ধর্মাগ্নি আহরণ করিতে পারিতেন—তবে কেন তিনি সংকীর্ণতা অবলম্বন করিয়া অন্য-সকল ধর্ম ফেলিয়া ভারতবর্ষেরই ধর্ম ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিলেন? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত—হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত—ধর্ম যদি গৃহের অলংকারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে দুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত—তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত।
>
> ['রামমোহন রায়']

যখন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের চারদিক থেকে রামমোহনকে আক্রমণ করা শুরু হয়, তখন তার জবাবে রামমোহন বলেছিলেন, 'কোনোদিনই আমি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিনি; আমার আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল কুসংস্কার ও গোঁড়ামি।' রবীন্দ্রনাথও কখনোই হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি, হিন্দুধর্মের অপ্রয়োজনীয় আচার-আচরণ অপছন্দ করেছেন, সেগুলোর সমালোচনা করেছেন।

বস্তুত হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত ভারতবর্ষের যে বৈদিক ধর্ম তার প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা ছিল রবীন্দ্রনাথের। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের

উপলব্ধিতে যে 'অবিনাশী' ব্রহ্ম, বেদান্তে যাঁকে বলা হয়েছে তিনি 'অপরিমিত সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ' শুধু নন, 'আনন্দস্বরূপ'ও, সেই একেশ্বরবাদী বৈদিক ধর্মের মূল ভিত্তির ওপরই রামমোহন প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রতিষ্ঠিত, অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও তা ভারতবর্ষেরই ধর্ম, বৈদিক ধর্মই। পরমসত্তা ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে ওই অল্প বয়সেই তিনি বলেছিলেন :

> আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্মে আছে, আমাদের ধর্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসো বৈ স:। তিনি রসস্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।...এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এই জন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এই জন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ।...এমন অসীম আনন্দের আঁকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জিত, ভারতবর্ষীয়দের উপার্জিত, আমাদের উপার্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব। এই জন্য রামমোহন রায় আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর, আত্মা হইতেও আত্মীয়তর এমন আর কোনো দেশের ঈশ্বর নহেন।
>
> ['রামমোহন রায়']

রামমোহন দেবেন্দ্রনাথদের ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে এ ভাষায় সেকালে আর কেউ বলেননি।

দেবেন্দ্রনাথ শুধু মরমি ধর্মসাধক ছিলেন না, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনও ছিল তাঁর অধীত। তিনি তাঁর *আত্মজীবনী*তে বলেছেন, 'আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম।' বিস্তর যে পড়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর পঠিত বহু দর্শনগ্রন্থের মধ্যে যে দুটি পাশ্চাত্য দর্শনের আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত তা হলো, জন লকের *অ্যান এসে কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং* এবং ডেভিড হিউমের *অ্যান ইনকুয়ারি কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং*। দর্শন বিষয়ে কোনো বড় বোদ্ধা ছাড়া ওইসব গ্রন্থ পড়ার আগ্রহ সবার নেই এবং থাকলেও তা আত্মস্থ করার সাধ্য খুব কম মানুষেরই রয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের তা যথেষ্টই ছিল, যদিও তিনি পাশ্চাত্যের প্রথাগত আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন স্বশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনচর্চায় উৎসাহ পান পিতার কাছ

থেকেই। তিনি পাঠ করেছেন লক, হিউমদের পরবর্তী দার্শনিকদের দর্শনশাস্ত্রও। এবং শুধু ইংরেজ দার্শনিক নন, ইউরোপের অন্যান্য ভাষার দার্শনিকদের রচনাও, যেমন দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশের দর্শন পর্যন্ত। যিনি নিৎশে পাঠ করেন তাঁর কান্ট, হেগেলও অপঠিত থাকার কথা নয়। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন নিয়েই জীবন অতিবাহিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শন সম্পর্কে তাঁরও গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি মনোযোগ দিয়েই কান্ট পাঠ করেন এবং কান্টের দর্শন নিয়ে লেখেন। আজীবন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় দাদার স্নেহচ্ছায়ায় ছিলেন।

পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব অধ্যাত্মচিন্তা ও অধ্যাত্মসাধনা থেকে একটুও সরে যাননি। বেদ উপনিষদের অব্যাহত চর্চা করেছেন গভীরভাবে। বাবার মতো তিনিও 'স্রষ্টার প্রতি নিবিড় বিশ্বাসে পঞ্জাব থেকে আরম্ভ করে হিমালয় পর্যন্ত সর্বত্র করুণাময় ব্রহ্মেরই লীলারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন'। তাঁর এই প্রত্যয় থেকে যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দর্শন তাঁকে নড়াতে পারেনি। বাবার মতো তিনিও পারস্যের মরমি কবি হাফিজের কবিতা ও দর্শনেও প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেন: রবীন্দ্রনাথের জীবনে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ উভয়েরই প্রভাব ছিল স্থায়ী। জন্মগতভাবে তিনি যে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন রামমোহন ও পরে দেবেন্দ্রনাথ। কারণ, রামমোহনের মৃত্যুর পর বস্তুত দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগীরা প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯), তারপর তাঁদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশ করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩) এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজের হাতেই 'ব্রাহ্মধর্মের' দ্বিতীয় পর্বের সূচনা। রামমোহনের সময় যা ছিল 'সর্বধর্মের মানুষের মিলনের 'club' মাত্র, দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা "সেটা একটা ধর্মের cult নিয়ে আবির্ভূত হল—তার নাম 'ব্রাহ্মধর্ম'।" যা সনাতন হিন্দুধর্মের আচার ইত্যাদি থেকে একেবারেই আলাদা বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ থেকে নয়। রামমোহনের ধর্মচিন্তা বিবর্তিত হয়ে এক নতুন রূপ ধারণ করে দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা। 'রামমোহন সব ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন করে ধর্মের নিগূঢ় বাণী সংগ্রহ করেন হিন্দু শাস্ত্র থেকে—তার নাম দেন Universal Religion।' [প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*]

বহুকালের ধর্মীয় আচার-আচরণ ও সংস্কার-কুসংস্কার বর্জন করা হয়। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষ 'এক পংক্তিতে বসিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন' করার রীতি চালু হয়। এমনকি একই সমাবেশে খ্রিষ্টান বাইবেল, ব্রাহ্মণ গীতা ও

মুসলমান কোরআন পাঠ পর্যন্ত করেন। এই 'সর্বশাস্ত্র পাঠের আয়োজন' ছিল রামমোহনের কাঙ্ক্ষিত 'বিশ্বধর্ম' প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্ব।

রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই তাঁর প্রবর্তিত সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে যায় : আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা। তবে আদি ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মসমাজ আরও বেশি সর্বধর্মসম্পৃক্ত ছিল। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান সমাজের জন্য যে শ্লোক-সংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদন করেন, তাতে সর্বধর্মের শাস্ত্রের সার সংকলিত হয়। তাঁদের উপাসনাকালে সর্বধর্মশাস্ত্র পঠিত হয়।
>
> [একই সূত্র]

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ এ রকম :

> একথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিককালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয়সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।
>
> ['ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা']

বিভিন্ন ধর্মের ভালো ভালো উপাদান নিয়ে ব্রাহ্মসমাজকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ছিল রামমোহনের। ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্মের সেরা শিক্ষা তো নিয়েছিলেনই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ওই 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'য় বলেন :

> রামমোহনের ধর্মভাবনা ও জীবনদর্শনের পটভূমে ছিল শাশ্বত ভারতের সাধনালব্ধ ঐক্যবাণী। সেই হিন্দু অদ্বৈত-ভাবনার উপর এসে পড়ে ইসলাম ধর্মের ও পারশিক-আরবীয় সংস্কৃতির প্রভাব, এবং তারপর সত্যানুসন্ধানের প্রেরণায় আয়ত্ত করেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সংস্কৃতি—খ্রীষ্টানী তথা য়ুরোপীয়তা—ভারত-ইতিহাসের সর্ব-অর্বাচীন আগন্তুক অতিথি।
>
> [*রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*]

বৈদিক ধর্মের বাইরে ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সাম্যের আদর্শ রামমোহনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রচলিত সনাতন হিন্দুসমাজের পূজা-পদ্ধতি তাঁর কাছে মনে হয়েছে অপ্রয়োজনীয়। ইসলামের একেশ্বরবাদ, খ্রিষ্টধর্মের মানবতাবাদ ও বৈদিক ধর্মের ব্রহ্মবাদের সমন্বয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান এক উদার ধর্মমত : ব্রাহ্মধর্ম।

ধর্মসাধনা

রবীন্দ্রনাথ নিছক ব্রহ্মতত্ত্ববিদ (Theologian) নন, তত্ত্বজ্ঞানী বা দর্শনতত্ত্ববিদও (Metaphysician) নন, যদিও ব্রহ্মতত্ত্ব ও দর্শনে তাঁর জ্ঞান অসামান্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবে এই দুই শাস্ত্রের সংস্পর্শে আসেন তিনি অতি অল্প বয়সে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০-১৯২৬) মতো কখনোই তাঁর চর্চার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি এই দুই শাস্ত্র। কবি ও সৃষ্টিশীল গদ্যলেখক হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়। একজন মহান কর্মযোগীও ছিলেন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন। তবে আমৃত্যু ব্রহ্মতত্ত্ব ও দর্শন ছিল তাঁর বিবেচনার বিষয়। হাজারো কাজের মধ্যেও এ বিষয় দুটি কখনোই তাঁর মনোযোগ থেকে দূরে থাকেনি। বরং তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ব্রহ্মতত্ত্ব ও দর্শন। ব্রহ্মতত্ত্ব বা অধিবিদ্যার অনেক উপাদান তাঁর কবিতায় ও গদ্যরচনায় ছড়িয়ে আছে। বহু লেখক তা খুঁজে বের করে দেখিয়েছেন।

পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে অনেকেই ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে কবি, কবিদের মধ্যে কেউ দার্শনিক। ওমর খৈয়াম, রুমি গ্যেয়েটে, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল প্রমুখ কবি-দার্শনিক। ইকবাল অবশ্য একজন একাডেমিক দার্শনিকও বটে। ওমর খৈয়াম তাঁর কবিতায় পরিবেশন করেছেন তাঁর জীবনদর্শন। ইকবালও তা-ই। তিনি তাঁর কাব্যে পরিবেশন করেছেন তাঁর খুদি দর্শন। কাজী নজরুল ইসলামও একজন দার্শনিক-কবি, 'বিদ্রোহী কবি' বলে তাঁর যতই পরিচিতি থাক।

রবীন্দ্রনাথ একাডেমিক দার্শনিকদের মতো দর্শনতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করেননি। সেটা তাঁর কাজ নয়। যুক্তি-তর্কের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে মানবতাবোধ ও অপরোক্ষ অনুভূতির পরিমাণই তাঁর দার্শনিক ভাবনায় বেশি। কিন্তু তাঁর চিন্তার মূল্য এখানে যে তা যুক্তিবিবর্জিত

ভাবালুতাও নয় অনেক মরমি ভাবুকের মতো। তাঁর বিচারবুদ্ধির সঙ্গে যখনই তাঁর বিশ্বাসের বিরোধ দেখা দিয়েছে তখন তিনি বুদ্ধি ও যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রচলিত ধর্মীয় আচার ও সংস্কার তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্মশাস্ত্র, যা 'চিত্তের উদ্বোধনের সহায়ক', তাকেও তিনি অসামান্য মূল্য দিয়েছেন। তাঁর ধর্ম পূজা ও যাগযজ্ঞের আনুষ্ঠানিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম ছিল না, তা মানবপ্রেমমূলক বিশেষ ধর্ম। তিনি বলেছেন :

> সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাকেই ধর্ম বলা হয়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত।
>
> ['ধর্ম প্রচার']

মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই ধর্ম পালনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, '...ধর্ম মানেই মনুষত্ব—যেমন আগুনের ধর্ম অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা।' কথাটি সহজ কিন্তু তা অনুশীলন করা কঠিন।

মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য 'সাধনা করতে' হয়; কারণ সাধনার অভাবেই, তিনি মনে করেন, 'সব মানুষ আজও মানুষ হয়ে ওঠেনি।' তাঁর দাবি 'যিনি এক, তাঁর কথাই' তিনি তাঁর 'মানুষের ধর্ম'-এ আলোচনা করেন।

ইমানুয়েল কান্ট যাকে বলেছেন 'উচ্চতর আজ্ঞাপক' (categorical imperative), রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'আন্তরিক আহ্বান' বা 'একটা নিগূঢ় নির্দেশ'। ঋকবেদ উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'মানুষের এক চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বাকি বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে।' তাঁর ভাষায় :

> মানুষ আছে তার দুইভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীবন আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবনকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা **নিগূঢ় নির্দেশ**। কোন দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।
>
> [মানুষের ধর্ম]

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের বিভিন্ন দার্শনিকের দর্শনগ্রন্থসহ জার্মানির ফ্রেডরিক নিৎশের রচনাও পড়েছিলেন। তবে তাঁর কাছে মানুষ ও 'অতিমানুষ' বা সুপারম্যান আলাদা কিছু নয়। মানুষের মানবিকতার ওপর রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অপার আস্থা।

কারণ, তাঁর ধর্ম মানবধর্ম। মানবধর্ম অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে উন্নততর করতে পারে। সম্ভবত নিম্নশ্লোকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলে থাকবেন :

> আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে, যিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা কেউ যদি বলেন তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি শোধন করি তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তার বাইরে অন্য কিছু থাকা-না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে তবেই যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হলুম কেন?
>
> [মানব ধর্ম]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মানুষে—অতিমানুষে নয়। বুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সে যতই উন্নততর হোক, পূর্ণতর হোক, শেষ পর্যন্ত সে যে মানুষ সেই মানুষই। মানবধর্মের বাইরে যাওয়ার শক্তি তার নেই। তিনি বলেন :

> পরিপূর্ণতা লাভের অগ্রযাত্রায় মানুষ যাই অর্জন করুক না কেন, এই মানবধর্মকে সে কোনোদিন পরিত্যাগ করবে না, করা উচিতও নয়।

উপনিষদের মন্ত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণের একত্বের যে আহ্বান তা ছিল রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রেরণার উৎস।

একটি সময় শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে একজন ধর্মনেতা বা আচার্যের মতো রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধর্মোপদেশ দিতেন। সেগুলো পরে বিভিন্ন নামের বইয়ে সংকলিত হয়। তাঁর জীবনীকারের অভিমত :

> 'ধর্ম' গ্রন্থ (১৯০৯) কবির সাত বৎসরের ধর্মোপদেশের—সবগুলিই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের পর রচিত। প্রায় রচনাই পৌষ-উৎসব মাঘোৎসব বর্ষশেষ নববর্ষ প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত—সাধারণের কাছে সাধারণ ধর্মতত্ত্বের কথা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত অনুভূতিমূলক আত্মতত্ত্বের সন্ধানচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। 'দুঃখ' নামক ভাষণে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।
>
> [প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৪৩]

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও দার্শনিক যুক্তিবাদের সমন্বয়ে শুধু নয়, বিভিন্ন দার্শনিক মত ও ধর্মীয় তত্ত্বের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব গঠিত হয়। প্রভাত মুখোপাধ্যায় মনে করেন :

ব্রহ্মমন্ত্র, ঔপনিষদ ব্রহ্ম ও ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশ ভাষণকে আমরা theological বা ধর্মতত্ত্বের আলোচনামূলক রচনা বলিয়া নির্দেশ করিব। কারণ ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যানই ছিল রচনার উদ্দেশ্য। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামক যে অপরূপ গ্রন্থ বাংলাভাষায় আছে, তাহা যদি কেহ শান্তচিত্তে পাঠ করেন তো তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে মহর্ষির আধ্যাত্মিক অনুভূতি স্বকীয় হইলেও, তাহা ভারতীয় ধর্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-বিষয়ক ভাষণগুলিও পাঠ করিলে আমাদের মনে হয় এ যেন মহর্ষির ব্যাখ্যানই কবির দৃষ্টি ও অনুভূতির অরুণ-আলোকে উদ্ভাসিত। 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালাকে কেবলমাত্র ঐ শ্রেণীর তত্ত্বমূলক ভাষণ বলিলে ভুল বিচার হইবে; এগুলি সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; উহার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিবাদ, জীবনশিল্পীর কর্মবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতার নির্দেশ দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন জগতের বিচিত্র ব্যবহারিকতাকে বা প্রকৃতির বিচিত্র স্বরূপকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিয়া অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় অবচ্ছিন্ন শূন্যতা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে নাই।

[*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৪৪]

রবীন্দ্রনাথ প্রায় তুলনাহীন বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভা, তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম বহু, তাঁর অনুভূতি প্রকাশের ধরন বিচিত্র এবং বিশাল কর্মময় তাঁর জীবন। শান্তিনিকেতন বক্তৃতাগুলোতে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ও অন্তর্জীবনের গভীরতর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

> শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা কবিজীবনের একটি বিশেষ পর্বের সাধনা-উপলব্ধ বাণীর সঞ্চয়, কয়েকটি মাসের নিবিড় চিন্তা ও ধ্যানের এবং অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ। কবিজীবনের এক একটি ভাবের উৎস এক এক সময়ে নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে—কবিতা নাট্য গীতি গল্প প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ পর্ব। কতকগুলি কবিতা অথবা গান এবং কয়েকখানি নাট্যও এক-এক সময়ে এক-একটি ভাবময় রূপচক্র সৃষ্টি করিয়াছে; এমনকি, তাঁহার পত্রধারাও এক-একটি ভাবধারার বাহন হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের উপদেশমালাকে সেইরূপ একটি বিশেষ পর্বের ধ্যান ও মননলব্ধ বাণীর প্রকাশ।
>
> [একই সূত্র, পৃ.২৪৪]

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা যখন রচিত হয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই সময়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখা দরকার। ব্যক্তিগত জীবনের নানা দুঃখবেদনা ও বিপর্যয় মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তন ঘটায়। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'শান্তিনিকেতনের ভাষণগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলির ভাবধারা সুপ্ত।' তাঁর ভাষায় :

ইহার পর কবিজীবনে যে পরিবর্তন আসিল তাহা গভীর শোকাঘাতে উজ্জ্বল—একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মনের আকুলতা সেই অবস্থায় বাণীময় রূপ লইল 'শান্তিনিকেতনে'র উপদেশমালায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকার, তিনি কখনো ধর্ম ও দর্শন আলোচনায় আপনাকে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না; যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়, ধ্যানের দ্বারা মনশ্চক্ষে দেখা যায়, তাহাকে রসের মধ্যে পাইয়া সুরের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতেছে কবির স্বধর্ম। সেটি হইতেছে গীতাঞ্জলির পর্ব।

[একই সূত্র, পৃ.২৪৫]

গীতাঞ্জলি, *গীতালি*, *গীতিমাল্যের* কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভক্তিময় প্রকাশ ঘটেছে। সেসব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে লিখেছেন বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এক ঘনিষ্ঠজনের অভিমত, 'ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে সমষ্টির যোগচেষ্টা হইতেছে নৈবেদ্য কবিতাগুচ্ছের নির্গলিত বাণী।'

অধ্যাত্মবাদী পিতার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই এক অস্পষ্ট অতিন্দ্রীয় জগতের সন্ধান পান রবীন্দ্রনাথ। যৌবনেই অদ্বিতীয় পরম সত্যকে উপলব্ধি করার এক তীব্র ব্যাকুলতা লক্ষ করা যায় তাঁর মধ্যে। ৩০-৩৫ বছর বয়সে শিলাইদহে জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে বৈষয়িক ব্যাপারে ডুবে থেকেও তাঁর মধ্যে দেখা যায় একধরনের বৈরাগ্য ভাব। যদিও অল্পকাল পরই তিনি এ কথাও বলেন :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা-বর্ণ-গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালিয়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

[*নৈবেদ্য*, ৩০ সংখ্যক কবিতা]

অতিন্দ্রীয় অনুভবকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান তিনি পান তার মূল্যই তাঁর কাছে বেশি। তিনি ওপরের ওই কবিতাতেই বলেছেন :

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ কবি যোগাসন, সে নহে আমার।

প্রার্থনার মাধ্যমে স্রষ্টার 'সান্নিধ্য ও করুণা' লাভের আকাঙ্ক্ষা আর দর্শনতত্ত্ব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা অবশ্য এক কথা নয়। *গীতাঞ্জলি* ও *নৈবেদ্য*র অধিকাংশ গানই ভক্তের প্রার্থনা। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রার্থনা :

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্রহৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে
কর্ম পারাবার-পারে হে,
নিখিল-জগত-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

[*নৈবেদ্য*, ১ সংখ্যক কবিতা]

তাঁর জীবনচরিতকার জানান, *নৈবেদ্য* ও *গীতাঞ্জলি*র 'এই পর্বটি কবির ব্রাহ্মধর্ম ব্যাখ্যানের পর্বের সমকালীন। এই সময়ে কবি সর্বপ্রথম ধর্মসম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন।' অর্থাৎ তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ধর্মবিষয়ক চিন্তা ও দার্শনিক মতামত একই সময় একই সঙ্গে প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও কবিতা-গানে প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব চর্চার সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বার্ধক্যজনিত কারণে দেবেন্দ্রনাথ যে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ছিলেন, ধর্মপ্রচারের সেই কাজটি তিনি তাঁর পুত্রকে দিয়ে পালন করান। তিনি জানতেন, পরিবারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই এ দায়িত্ব পালনে সবচেয়ে যোগ্য। রবীন্দ্রজীবনীকার আরও জানান :

> নৈবেদ্য রচনার পর্বে মহর্ষির আদেশে কবিকে শান্তিনিকেতনের দশম সাম্বৎসরিক (১৩০৭) উৎসবের ভাষণ 'ব্রহ্মমন্ত্র' লিখিতে হয়; ইহাই তাঁহার ধর্মবিষয়ক তৃতীয়

দেশনা। ইহার পূর্ব বৎসরে ১৩০৬ সালের শান্তিনিকেতনের নবম বার্ষিক উৎসবের জন্য কবি 'ব্রহ্মৌপনিষদ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকাটি পরে 'উপনিষদ ব্রহ্ম' নামে পুস্তিকাভুক্ত হয়। উহা মাঘোৎসবে পঠিত হয়। এই দুইটি রচনাকে কবি তাঁহার 'ধর্ম' নামক গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার ৮ম বর্ষে ৭ পৌষ (১৩০৫) 'নিরাকার উপাসনা' শীর্ষক যে ভাষণ দান করেন, তাহা কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

বৈষ্ণবীয় প্রেমের ভাব *গীতাঞ্জলির* কোনো কোনো কবিতা ও গানে সুস্পষ্ট :

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে?

[১২০]

শাস্ত্রনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক সাধনার কথা *গীতিমাল্যর* অনেক কবিতায় দেখা যায়। কোনো গুরু বা শাস্ত্র নয়, তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিই তাঁকে পথ প্রদর্শন করে :

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাবো কাহার দ্বার?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার।

[৬২]

পারস্যের কবি হাফিজ, যাঁর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন আপ্লুত ও প্রভাবিত, অনেক আগেই এ কথা বলেছেন, পথ ও গন্তব্যের তফাত নেই—

পথিকদের পথক্লান্তি নেই।
প্রেম পথও বটে, মনজিলও বটে।

প্রেমের পথের পথিক রবীন্দ্রনাথও। কবি তিনি, তাই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক-সত্তা ও সাধক-সত্তা তাঁর কবি-সত্তার ওপরে বিজয়ী হতেই পারে না। নিরাকার ব্রহ্মের চেয়ে দৃশ্যমান সুন্দর ও শ্যামলা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আনন্দে তাঁর চোখে জল আসে। কবির ভাষায় :

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,

লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

['পুরস্কার', *সোনার তরী*]

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন, গান ও নাটক অবিচ্ছেদ্য ও সম্পূরক। তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা দার্শনিক তাৎপর্যে বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় রয়েছে তা সব লেখকই বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক আকুতি যে কেবল গীতধারায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা নহে; তাঁহার সাহিত্য-হৃদয় প্রকাশের বিচিত্র পথে চলিয়া আপনাকে সার্থক করিয়াছে; শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর—নাটকচতুষ্টয় এই পর্বেরই রচনা। এইসব নাটকের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের চিত্র কবি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই অবচেতন মনের সংগ্রাম। এইসব symbolic বা symbolistic নাটিকাগুলি 'খেয়া'র রাহস্যিক কবিতার সমসূত্রে বিচার্য।
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৪৫]

জীবনের একটি পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু উপনিষদে আবদ্ধ ছিলেন না। বৌদ্ধধর্ম, খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের বাণী তিনি অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করেন। মধ্যযুগের লোকায়ত ধর্ম ও সাধুসন্তের বাণী তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছেন এবং তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> শান্তিনিকেতন-উপদেশমালা রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতার লিখিত সঞ্চয়ন। এই কয়েক খণ্ড গ্রন্থ শান্তভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা কবির একটি সুসংগত ধর্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই ধর্মতত্ত্ব 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের উপর প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহার সহিত সনাতনী ব্রাহ্মধর্মের সর্বাঙ্গীন মিল নাই। উপনিষদ-কেন্দ্রিত ধর্মবিশ্বাসকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না করিয়া রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সংজ্ঞাকে বৃহত্তর পটভূমি-মধ্যে ব্যাখ্যা করিলেন।
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৪৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্ম প্রচলিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মধর্মের চেয়ে আরও বিস্তৃত, আরও উদার, আরও শাস্ত্রনিরপেক্ষ। তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রার্থনা ও উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা কামনা করেছেন। ব্যবহারিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য বাস্তববাদী যুক্তিবাদী, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে পরম বিশ্বাসী। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল, ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য তাঁর সাধনা ছিল নিরন্তর। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় :

> ঈশ্বর যেমন পরম সত্য, তেমনি তিনি দৃশ্যমান নন বলে ভক্ত তাঁকে নানা রূপে কল্পনা করে। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যুগে যুগে মানুষ বিচিত্র রূপে

কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সাধনা করেছে। সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরপ্রাপ্তির নানা মত, নানা পথ: ঈশ্বর মহাভিক্ষুকরূপে ধীরে উপস্থিত, ঈশ্বর বিরহীরূপে কাতর ইত্যাদি কল্পনা সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় অথবা উপনিষদ যুগের পরের যোজনা। এই ধর্মসাধনা বহুল পরিমাণে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিক রূপ হইতে উপলব্ধ।

[*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৫৪-২৫৫]

পদ্ধতি বিচিত্র ও বিভিন্ন হলেও সব আস্তিক্যবাদী ধর্মের অনুসারীরাই উপাসনার মাধ্যমে স্রষ্টার করুণা লাভের চেষ্টা করেন অনাদিকাল থেকেই। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ঈশ্বরকে পাওয়ার আকুলতা ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। সে জন্য উপাসনার গুরুত্ব তিনি 'অস্বীকার' করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রসিদ্ধ পূজা-অর্চনা নয়, ব্যক্তিগত উপাসনা ও প্রার্থনাকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। উপাসনা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তাঁর জীবনীকারের ভাষায়:

> আধ্যাত্মিকতার অনুকূলে জীবনে যে পরিবর্তন ঘটে, তাহার মূলে আছে উপাসনা। রবীন্দ্রনাথ দৈনিক উপাসনা করিতেন এবং বিশেষ মন্ত্রকে ধ্যান করিতেন। "মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি।" [মন্ত্রের বাঁধন, ২৭ চৈত্র, ১৩১৫, শান্তিনিকেতন] মন্ত্র সম্বন্ধে কবি দুই বৎসর পরে এক পত্রে লিখিতেছেন, "আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতানোহসি' এবং 'অসতোমা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্', এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে—কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি।" "কবির অন্তরের ইচ্ছা ছিল যে 'প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়'।" [সঞ্চয়তৃষ্ণা] কিন্তু প্রতিদিনের সহিত বিশেষ দিনের ভেদ ঘটাইয়া মানুষ বিশেষ দিনের উত্তেজনার আনন্দ ভোগ করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু বিশেষ দিনের 'উৎসবশেষে' 'ভাঙা হাটে' মন তাহার অবসাদগ্রস্ত হয়; বিশেষ দিনে যাহা সে পায়, অন্য দিনে সে তাহা উড়াইয়া দিয়া, দেউলিয়া হইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যথার্থ সাধক 'প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে'; তাহার জীবনে উৎসবদিনের সহিত প্রতিদিনের পার্থক্য নাই—সে নিত্য উপাসনাশীল, তাহার অন্তরে চির উৎসব।
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৫৫]

উপাসনা হতে হবে নিঃস্বার্থ, মনের প্রশান্তির জন্য, পরলোকে কিছু প্রাপ্তির

আশায় নয়, পুণ্যের আশায় নয়, পুরস্কারের লোভে নয়; ওই উপাসনা স্বার্থপরের উপাসনা। প্রভাত মুখোপাধ্যায় আরও জানান :

> উপাসনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণত লোকের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট; অনেকের ধারণা নিত্য উপাসনা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই ধারণা হইতে যাঁহারা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পূজা ঈশ্বরে পৌছায় না, পুণ্যের জন্য পূজা হয়। বলা বাহুল্য ইহা এক প্রকার পারলৌকিক বৈষয়িকতা [other worldliness]। লোকহিত, দান কর্মাদির দ্বারা মানুষ যেসব পুণ্য সঞ্চয় করে, তাহার পিছনে আছে ভগবানের কাছে পুরস্কারের লোভ, সুতরাং এই ধর্মকার্য অন্য পাঁচরকম বিষয়কর্ম হইতে কম বৈষয়িক হয় না। পুণ্য অর্জনের উত্তেজনা হইতে মানুষ পৃথিবীতে অনেক রক্তপাত করিয়াছে। 'তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব—এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে—ঈশ্বর করবেন, সে আর মনে থাকে না। ...কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।' [সঞ্চয়তৃষ্ণা, শান্তিনিকেতন ১]
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৫৫]

হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে বাংলাদেশ মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন জন্মসূত্রে বৈদিক হিন্দুধর্মের অনুসারী হলেও বাংলাদেশের মুসলমানদের একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ধর্মান্ধ মোল্লাদের ইসলাম নয়, তিনি শিক্ষা নিয়েছিলেন মূল আরবি ভাষায় অথবা ফারসিতে রচিত ইসলামি ধর্মগ্রন্থ থেকে। কোরআন-হাদিস তাঁর অপঠিত ছিল না। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে খ্রিষ্টধর্মের মূল শিক্ষা থেকে তিনি মানবতাবাদী উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারায়ও সিক্ত হন। এদিকে ভারতবর্ষীয় তন্ত্র থেকে প্রেরণা পান। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার ধারণাটি মূলত উপনিষদ ও ইসলাম থেকে গ্রহণ করেন। রামমোহন সম্বন্ধে এক বক্তৃতায় প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন :

> আমরা উপসানা ও পূজা শব্দ পৃথকভাবে ব্যবহার করছি। হিন্দুদের মধ্যে যে পূজাবিধি দেখা যায় তার বুনিয়াদ হচ্ছে তন্ত্রাচারে; বৈদিকতা তার উপর সাজানো। যাগযজ্ঞ বৈদিক ও আর্য শব্দ; কিন্তু পূজা ও পুষ্প শব্দ দুটিই দ্রবিড়ভাষা-উদ্ভূত। প্রাক্-আর্য ও দ্রবিড় এবং সিন্ধু-হারাপ্পান অসুর-সংস্কৃতির পুষ্প দিয়ে পূজা, তন্ত্র-মতে যন্ত্র নির্মাণ করে হোম-আদি অনুষ্ঠান এবং বৈদিক যাগযজ্ঞাদি—সবের উপর সুপারস্ট্রাকচার—এইসব মিশিয়ে যে নবপূজা-পদ্ধতি চালু হয় তাকেই বলা হয় 'হিন্দুধর্ম'। আসল বুনিয়াদ দ্রবিড় ও প্রাক্-দ্রবিড় অসুর সংস্কৃতি। বৈদিকতা basical নয়। রামমোহন **ব্রহ্ম-উপাসনা প্রবর্তন করেন, পূজা নয়**। কারণ পূজার সঙ্গে পার্সোনাল গড-এর সম্বন্ধ

জড়িত। সগুণ-সাকার দেবতার পূজা বা ম্যান-গড বা মানুষ-দেবতা বা অবতারের পূজা কঠোর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে খাপ খায় না। রামমোহন যে ধর্মকে সর্বমানবের জন্য মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তার বুনিয়াদি মনঃশিক্ষার পটভূমে আছে ইসলামধর্ম ও মুসলমান সমাজের আদর্শবাদ। এটি তিনি পেয়েছিলেন বাল্যে ও কৈশোরে ফার্সি ও আরবি ভাষা অধ্যয়নকালে; এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপ দেখা দেয় তাঁর প্রথম রচনা তুহ্ ফাৎ-মুয়াহ্হিদীনের মধ্যে। পরিপক্ক বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য মনীষীদের গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন। য়ুরোপের হিউম্যানিজ্‌ম্ নিয়ে যাঁরা চর্চা করছিলেন তাঁদের গ্রন্থ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন; এই সবের সমবেত মতবাদ তাঁর মনকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনা থেকে।

[রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, পৃ.২১৪-২১৫]

ভারতবর্ষে প্রচলিত সব উদার ধর্মমতকে রামমোহনের মতো রবীন্দ্রনাথও মূল্য দিতেন। এ ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি ছিলেন আরও বেশি উদার ও সংস্কারমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার সময়ও সর্বধর্মশাস্ত্র থেকে পাঠে কোনো বাধা ছিল না। তাঁর জীবৎকালে এবং আজও সব ধর্মের মানুষই শান্তিনিকেতনের কাচের উপাসনা-ঘরে প্রতি বুধবার ভোরে মিলিত হয়ে যার যার মতো প্রার্থনা করতে পারেন।

মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথ অশৈশব ধর্মসাধক পিতা দেবেন্দ্রনাথের সাহচর্যে বেড়ে উঠলেও প্রথাগত ধর্মাচারের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। মানবজীবনের শাশ্বত মূল্যবোধের অনুশীলনই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের উপাসনার মতো গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের করুণায় সিক্ত হওয়ার জন্য তাঁর যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা তা নিজের ভেতরকে কলুষতামুক্ত করে শুদ্ধ ও পবিত্র করার একটি উপায়মাত্র। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একটা আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু যে প্রার্থনা ও পূজা আচারসর্বস্ব এবং যা বহু মানুষ হয় একাকী পৃথক পৃথকভাবে অথবা সংঘবদ্ধভাবে করে—তার কোনো মূল্য ছিল না রবীন্দ্রনাথের কাছে। তাঁর উপাসনা ছিল অপ্রথাগত—প্রথাগত ততটুকুই যতটুকু দেবেন্দ্রনাথের পুত্র হিসেবে না করলেই নয়।

তবে সম্পূর্ণ প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত ছিল না রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনও। প্রার্থনা তিনিও করতেন, তবে পূজা-অর্চনা, সংঘবদ্ধ প্রার্থনা ও তীর্থযাত্রার মধ্য দিয়ে একান্তই ঈশ্বরকে পাওয়ার যে চেষ্টা তাতে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। যিনি ইন্দ্রিয়াতীত ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণের চেষ্টা বৃথা, ব্রহ্ম প্রত্যক্ষণের বস্তু নন, অনুভবের বিষয়। প্রার্থনার চেয়ে ব্রহ্ম-সাধনা তাঁর কাছে মুখ্য। তিনি বলেন :

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদবোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

['ধর্মের সরল আদর্শ']

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁদের পরিবারের অনেকেরই উপাসনা ও প্রার্থনার পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সর্বাগ্রজ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের উপাসনাপদ্ধতি সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন :

...১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে, 'নূতন বাড়িতে' কয়েক মাসের জন্য আমার আশ্রয় জুটেছিল। তখন অনিদ্রা-কাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ করে আমলকী গাছের তলায় পাইচারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধুর কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রীষ্মে স্নানাদি সমাপন করে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকে আমি শান্তিনিকেতনের অন্য প্রান্তে ঐ একই আচারনিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট; বড়বাবুর একাশি।

[বড়বাবু]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সম্পর্কে প্রভাত মুখোপাধ্যায় যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা বিবেচনার দাবি রাখে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি কাছে থেকে দেখায় তাঁর বিশ্লেষণ মূল্যহীন নয়। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—

"আমাগিকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ইপ্সিত ধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।" [প্রার্থনা] পূর্ব হইতে সব দেওয়া আছে ইহা যদি স্বীকার করা হয়, তবে দর্শনের ও ধর্মের অনেক জটিল সমস্যা উঠে। Predestintion মানিলে progress মানা যায় না; কবি এসব জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের একটি বড় অঙ্গ হইতেছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম সম্বন্ধে সচেতনতা, মানুষ আপনাকে বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তরপ্রকৃতির নিয়মের অনুগত না করিতে পারিলে আপনাকে ব্যর্থ করে ও চারি দিকে অশান্তির সৃষ্টি করে। "এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা", কবির মতে "এই

শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।" [শান্তিনিকেতন-১] অর্থাৎ, বিজ্ঞানের সাধনা হইতেছে ধর্মসাধনারই অঙ্গ। বিশ্বপরিচয় লাভ বিশ্ববিধাতাকে জানিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ শক্তির মধ্যে তিনি নিয়ম স্বরূপ, তথায় তিনি শান্তম্। শান্তম্ বলিয়াই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁহাতে ধ্রুব আশ্রয় পাইতেছে।

শক্তির মধ্যে যে শান্তরূপটি বিদ্যমান এই তত্ত্বটি আমরা জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। "যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাযথ না হত, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তা হলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত।" কিন্তু তাহা হয় না, কারণ সত্যের স্বরূপ হইতেছে শান্তম্। কবি অন্যস্থলে বলিয়াছেন, "জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং।" [শান্তং শিবমদ্বৈতম] এইজন্যই সত্য শান্তম্ বলিয়াই শিবম্ বা মঙ্গলময়। কারণ নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব, অমঙ্গল। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানে তিনি আনন্দময়, প্রেমময় এবং সমস্ত বিধৃত অদ্বৈতমের ভিতর। আমাদের জীবনের বুনিয়াদ শান্তম্-এর মধ্যে, তাহার ব্যাপ্তি শিবম্-এ ও তাহার পরিণতি অদ্বৈতম্-এ।

এক দিকে সত্য অর্থাৎ world of realities বা বিজ্ঞান অথবা প্রকৃতির জগৎ—অপর দিকে আনন্দলোক, মাঝখানে মঙ্গল। নিয়মের জগৎ ও আনন্দের জগতের মাঝখানে আছে সংসার ও সমাজ—মঙ্গল কর্মের ক্ষেত্র। আমাদের দেশে যে চতুরাশ্রম ছিল তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ যথাক্রমে শান্তম্, শিবম্ ও অদ্বৈতম্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করিলে গৃহস্থধর্মে মঙ্গলস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয় বা অদ্বৈতের উপলব্ধি। "সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী।" [শান্তিনিকেতন-১]

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পার্থক্যদান বা বিশেষত্ব দান করিয়াছেন; তেমনই প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যেকটি বস্তুতে যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিয়মের দ্বারা পৃথকীকৃত। "বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানাপ্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন।" [পার্থক্য, শান্তিনিকেতন-১] বিবিধ নিয়মের দ্বারা সীমার সৃষ্টি; নিয়ম না থাকিলে সমস্ত একাকার হইত—নিয়ম হইতে আকারের উদ্ভব।

[*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৫৮-২৫৯]

উপনিষদের উপদেশ ও দর্শনে রবীন্দ্রনাথের ছিল অবিচল বিশ্বাস। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর নিজের উপলব্ধি। ভারতবর্ষের মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান বা ধর্মজ্ঞানই উৎকৃষ্ট ধর্মজ্ঞান তাতে প্রথম জীবনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না তাঁর। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রুভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধ আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।
>
> ['প্রার্থনা']

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক বলা চলে, বেদান্তদর্শনে যাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। তাঁর সমকালের বহু বেদান্তদার্শনিক ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হতো। এ কথা জানা যায় তাঁর জীবনীলেখকের বড় ছেলে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আক্ষরিক অর্থে 'বেদান্ত' হলো 'বেদের অন্ত বা শেষ'। প্রথমে বেদান্ত দ্বারা উপনিষদকে বোঝাত। 'বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্'—অর্থাৎ উপনিষদের যা প্রমাণ তাই বেদান্ত। কালানুক্রমিক বিচারে বৈদিক সাহিত্যের সর্বশেষ স্তর হলো উপনিষদ। বেদের চারটি অংশ : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক যুগের সবশেষ সৃষ্টি উপনিষদে বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যার আলোচনা রয়েছে। প্রাচীনকালের ঋষি-দার্শনিকেরাই উপনিষদের রচয়িতা। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মতত্ত্বই উপনিষদ, যা সংখ্যায় বহু। উপনিষদে মানবজীবনের বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে এবং তার সমাধান দেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্যে চিন্তার ঐক্য থাকলেও বিভেদও রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের জন্য সামঞ্জস্য আনতে সেসব গুছিয়ে সংকলিত করে একসময় একটি সংহত মতবাদে দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয়। সে কাজটি করেন বাদরায়ণ তাঁর *ব্রহ্মসূত্রে*। তবে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রগুলোও খুবই সংক্ষিপ্ত। সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করা সাধারণের পক্ষে কঠিন। তাই পরবর্তীকালে ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয় দার্শনিকদের দ্বারা। ভাষ্যকারদের মধ্যে শংকরাচার্য, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক প্রমুখ রয়েছেন।

বিভিন্ন ভাষ্যকারের ভাষ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ওই সব ভাষ্যের আবার ভাষ্য-টীকা-ব্যাখ্যা প্রভৃতি হতে থাকে। যার ফলে বেদান্ত সাহিত্য বিপুল আকার ধারণ করে। জীব অর্থাৎ মানুষ ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কী—এই প্রশ্ন নিয়ে বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে

একসময় মতভেদ দেখা দেয়। শংকরাচার্য বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তাঁর মতবাদ অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। মধ্ব-র মতে, জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর মতবাদ হলো দ্বৈতবাদ। রামানুজের মতে, জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক 'অংশ' ও 'অংশী'র সম্পর্ক। তাঁর এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

ভারতীয় দর্শনে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মতবাদ বা তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক পণ্ডিতদের কাজ। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল প্রতিভা। তিনি মতবাদ নিয়ে মাথা ঘামাননি—তিনি জোর দিয়েছেন সত্যের ওপর। প্রভাত মুখোপাধ্যায় শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখেননি, তিনি তাঁর সংস্পর্শে থাকায় তাঁর অন্তর্জগতেরও সন্ধান রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক সত্তা ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত অবহেলা করা যাবে না। তিনি লিখেছেন :

> দার্শনিক তত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—দ্বৈত ও অদ্বৈত—বিচার করেন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়।" ['মত', শান্তিনিকেতন-১] 'মায়াবাদ' কথাটা শুনিলেই দ্বৈতবাদীরা অসহিষ্ণু হন; অথচ কবির প্রশ্ন, "আমরা কি এককে আর বলে জানি নে?...আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে 'আমি' বলে ঠিক করে বসে আছি...যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে—ও সমস্ত মিথ্যা ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে।" লেখকের মতে মায়া হইতেছে এই চারি দিকে আপাতপ্রতীয়মান দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের দ্বারাই বিশ্ব খণ্ডিত। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-কেন্দ্রানুগ শক্তি, কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতার দ্বারা আপনাকে সৃষ্টিরূপে নিয়ত প্রকাশমান করিতেছে; অথচ গভীরভাবে দেখিলে বিরোধ সংসারেই দেখা যায়—ব্রহ্মে পূর্ণতা।
>
> অখণ্ড অদ্বৈতের সাধকগণ ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া জানেন; অথচ বিশিষ্টতা বলিয়া একটি আশ্চর্য পদার্থ যে আছে, তাহাকেও মানুষ অস্বীকার করিতে পারিতেছে না; তাহাকে "মিথ্যাই বলি আর মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে।" ['নির্বিশেষ', শান্তিনিকেতন-১] এই বিশেষের উদ্‌ভব ও অস্তিত্ব কিভাবে হইল তাহার উত্তর পাওয়া যায় উপনিষদে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' অর্থাৎ "ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা-কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ।" কিন্তু ইহা যুক্তি নহে, প্রমাণও নহে, সাধকের উক্তিমাত্র। আধুনিকরা এই উত্তরে তৃপ্ত হইবেন না।
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৬১-২৬২]

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধি ও তাঁর চিন্তার সঙ্গে যদি শাস্ত্রের মিল খুঁজে না পাওয়া যেত, তাতে তিনি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতেন না। যতটা শাস্ত্র

থেকে পাওয়া যেত ততটা গ্রহণ করতেন, প্রয়োজন হলে তার সঙ্গে যোগ করতেন নিজের উপলব্ধি। চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। তবে তাঁর বিশ্বাস তিনি অন্যের ওপর চাপানোর প্রয়োজন বোধ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব বা তাঁর ধর্মসাধনার একটি সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তাঁর জীবনীর এই কথাগুলোতে :

> সর্বজগৎ ব্রহ্মময়, এ কথা ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের মূলকথা। "এই বিশ্বসংসারে এমন কিছুই নেই, একটি কণাও নেই, যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন।" ['দ্রষ্টা', শান্তিনিকেতন-১] এই অদ্বৈত ধারণা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সংস্কারের মূলে। ব্রহ্ম সর্বগ হইয়া সবার অতীত; অথচ যে সংসার তাঁহার দ্বারা বিধৃত সেখানে সৃষ্টি ব্যাপার নিয়ত চলমান। "সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে—এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিণতির পথে চলেছে, কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই।" ['পরিণয়', শান্তিনিকেতন-১] এখন প্রশ্ন উঠে জীব কি লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলিবে? "...অবিশ্রাম চলা, ...অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?"
>
> অনন্তকাল গতি সরল রেখায় চলে না, সত্যে বা বিজ্ঞানে রেখা গোল। "তর্কে এইপ্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে, কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে এক জায়গায় সে আলোর গোল হয়ে ওঠে।" ['নির্বিশেষ', শান্তিনিকেতন-১] ইহার একটি মাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নাই, অবসরও নাই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্ব দিকের পূর্বত্ব নাই, পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নাই, পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানে বিরোধ নাই, বিচ্ছেদও নাই। পূর্ব-পশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে।
>
> এই সমাপ্তিহীন গতিকে মানুষ অনন্ত উন্নতি বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাই কবির প্রশ্ন—"যাঁকে কোনোকালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে?" সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নাই, সংসারের তত্ত্ব হইতেছে সরিয়া যাওয়া; পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। এবং সেই ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আছেন তাহা যথার্থ উপলব্ধি হইতে কথিত বাণী নহে; তিনি সর্বময়, বৃহৎ ও অনন্ত; তাঁহার সম্বন্ধে ক্রমাভিব্যক্তির (creative evolution) কথা উঠিতে পারে না।
>
> মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন বা ধর্মসাধনার বাধা অসংখ্য; তবে দুইটি বাধাই বড়। প্রধান ও প্রথম হইতেছে প্রত্যয়ের বাধা বা বিশ্বাসের অভাব। বিশ্বাস, কবির মতে, একটি নিশ্চিত আধার; উহা সমস্ত চিত্তের একটি

অবস্থা, একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয় তবু তো মন ইহাতে ধ্রুব হইয়া অবস্থিতি করে। এই বিশ্বাসকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করিবার জন্য মানুষকে পুণ্যের জন্য ধর্মসাধনার প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ ধর্মের দিক হইতে উহাকে সদুপদেশ বলা যাইবে না।

সাধনার দ্বিতীয় বড় বাধা হইতেছে সাধনার অনভ্যাস। বিশ্বাস বা প্রত্যয়ে সাধকের চিত্ত স্থির হয়, কিন্তু সাধনার চেষ্টায় বা অভ্যাসে উহা গতিলাভ করে। [দ্রষ্টব্য 'সংহরণ', শান্তিনিকেতন] ব্রহ্মসাধনার পথে সাধকের একমাত্র সম্বল হইতেছে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা যে কেবল সাধনার শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়া সাধককে চালনা করিয়া লয় তাহা নয়, সে সাধককে কেবলই সতর্ক করিয়া দেয়, শৈথিল্য ও অমনোযোগ যেন তাহার পথরোধ না করে। ['নিষ্ঠা'] 'সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ।' ['নিষ্ঠার কাজ']

ধর্মসাধনার লক্ষণ ও লক্ষ্য কী? এতদসম্বন্ধে কবি ফলের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমাদের একটি বাউলের গান স্মরণ হইতেছে—'ভিতরে রস না জমিলে, বাহিরে কি গো রং ধরে?' এই গানের সহজ পদটির মধ্যে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সাধনের লক্ষণ প্রকাশ পায় এইভাবেই তাহার বাক্যে, তাহার ব্যবহারে। তাহার কঠিন হৃদয় কোমল হয়, চারিত্রিক তীব্রতা মাধুর্যে পরিণত হয়। ''সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে'', ['ফল'] ''যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। কঠিন ধর্মসাধনার অন্তরালে থাকে।'' [শান্তিনিকেতন] এই অবস্থায় তাহার অহংজ্ঞান লোপ পায়। সাধনের বহির্জগতের আকর্ষণ আসে শিথিল হইয়া, আর তাহার লাভটা হয় ভিতরে এবং দানটা হয় বাহিরে।

[*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ.২৬৩-২৬৪]

প্রাচ্যের প্রায় সব প্রধান ধর্মেই পরকাল একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বহু ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ মানুষ ইহজীবন দুঃখদুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাদের কাছে পরকালের ধারণা অর্থহীন নয়। ইহকাল ও পরকাল—এই দুটি 'পারেরই রসিক' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ কথা বলেছেন ইন্দিরা দেবীর মতো তাঁর স্নেহভাজনীয়া এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো কোনো কোনো লেখক। পৃথিবীর বহু ধর্মই পরকালকে খুবই গুরুত্ব দেয়। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কোরআনে পরকালের ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মেও তাই। পরকালকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না, প্রতীকী অর্থে। ঠাকুর-পরিবারে অনেকেরই কোরআন অপঠিত ছিল না, কেউ কেউ পাঠ করেছিলেন মূল আরবিতেই। বাংলাভাষা বা ইংরেজিতে অনূদিত কোরআন ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের বই রবীন্দ্রনাথেরও অপঠিত ছিল—তা মনে করা অনুচিত হবে।

ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ, কবি ও ধর্মসাধক রবীন্দ্রনাথকে কিছুটা দূর থেকে হলেও পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন এক লেখকের মন্তব্য অবশ্য এরকম :

> রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন, নামে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূলত নয়। তাঁহার জীবনে পরলোকের যেমন স্থান ছিল, তেমনই ইহলোকেরও ছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, সারা জীবনেও তাঁহার পরলোকে আস্থা বিচলিত হয় নাই বা ক্ষুন্ন হয় নাই; তিনি জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন, নৈরাশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন ইহজীবনে এই সব পীড়া ও অসম্পূর্ণতা পরলোকে থাকিবে না, ইহজীবনের সমস্ত সত্যকার ঐশ্বর্য ও গৌরব পরলোকে পূর্ণতা পাইবে। তবু এই অসম্পূর্ণ ইহলোককেই তিনি সমস্ত দেহমন দিয়া অবলম্বন না করিয়া পারেন নাই। ইহাকেই ইন্দিরা দেবী 'দুই পারের রসিক হওয়া' বলিয়াছেন। আসলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র ইহলোকের রসিক বলিলে ইহলোকের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। তিনি কখনই একথা ভুলিতে পারেন নাই যে মানুষের যে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগোচর, যে অস্তিত্ব তাহার সকল কামনাকে টানে, তাহা ইহলোকে মানুষমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যুর মাঝেকার অস্তিত্ব।
>
> [নীরদচন্দ্র চৌধুরী, 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও ঈশ্বর ভক্তি' *আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়]

রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত আনুষ্ঠানিক ধর্মাচারের চেয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর বহু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি কবির ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর উপলব্ধির গভীরতা তাতে ক্ষুণ্ন হয়নি :

> ...আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষীশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না, এও সেই রকম।
>
> এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে, তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা, কী অনির্বচনীয় আনন্দ, তা আমরা জানি নে, কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আবাসমাত্রও পাই নে!
>
> আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ, তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানে আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে, এটি জানতে হবে। **আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি-দ্বারা নয়।** সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে ব'লে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই ব'লে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই; এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমার আত্মা দিয়ে দেখি নে—ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে, সংসার দিয়ে, সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ বা প্রয়োজনের মানুষ বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো-একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়, সেইখানেই দরজা রুদ্ধ, তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত : তুমি এসেছ!

['আত্মার দৃষ্টি', শান্তিনিকেতন]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কখনো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ অবিচল অদ্বৈতবাদী, কখনো দ্বৈতবাদী, কখনো বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কিন্তু তাঁর জোর আধ্যাত্মিক সাধনার ওপর। তিনি বলেন :

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে : তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি। ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বদাই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে। সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছালে সে দ্বারে এসে ঠেকে, সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়—অমৃতং যদ্‌বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না—সে আর-সমস্তই দেখে, কেবল আনন্দরূপমৃতং দেখে না।

এই-যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের

অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

['আত্মার দৃষ্টি'. শান্তিনিকেতন]

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি।' তিনি বলেছেন, 'এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে আছে।' উপনিষদে উচ্চারিত মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করেছেন তা আর কেউ করেননি। তিনি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায়নি। সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

['প্রার্থনা']

রবীন্দ্রনাথের নারীবিষয়ক ভাবনা পশ্চিমের আধুনিক নারীবাদী ধারণা থেকে আলাদা। তিনি নারীর অধিকারের চেয়ে মর্যাদার ওপর জোর দিয়েছেন। তপস্বিনী মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ এ রকম :

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।—হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে! হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে! হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম

আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও, তা হলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। হে রুদ্র, হে ভয়ানক, তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্, তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এসো, সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্রচরণদুটি আজ স্থাপন করো। তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

[প্রার্থনা]

উপনিষদ তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি হলেও উনিশ শতকের প্রথম দিকের বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। শতাব্দীর প্রথম দিকে রামমোহন যখন 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হন' তখন বাংলাদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ছিল প্রবল, আর ছিল 'শাক্ততান্ত্রিক ধর্ম। বৈষ্ণবরা দ্বৈতবাদী প্রীতিমার্গের বিচিত্র সাধনার পন্থী। কিন্তু এই বৈষ্ণব বলতে কেবল ধর্ম বোঝাত না, বৈষ্ণব সমাজও বোঝাত।' রবীন্দ্রনাথের বহু গানে বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের ছাপ সুস্পষ্ট।

বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে ব্রহ্মকে 'রসোবৈশঃ বলা হয়েছে—বৈষ্ণবরা রসসাধনায় বিশ্বাস করতেন। বৈষ্ণবরা ছিলেন সংসারী ও বিষয়ভোগী—'বোষ্ণবী' বা শক্তি না পেলে তাদের সাধনা পূর্ণ হয় না।' 'এই নারীই তার শক্তি প্রভৃতি, রাধা, হ্লাদিনী।' বৈষ্ণব ধর্মচর্চা গ্রামীণ সমাজেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল, শহরের শিক্ষিতদের মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনকেও অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর কবিমন ওই দর্শন থেকে উপকৃত হয়েছিল। তাঁর মানবধর্ম মানবতাবাদী বৈষ্ণব ধর্ম থেকে অনেক উপাদান গ্রহণ করেছিল।

বাউল ও লোকজ মানবধর্মের প্রভাব

রবীন্দ্র-অনুসারী ভাবুক ও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বাঙালির বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ও ধর্মসাধনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন :

> দার্শনিক সব গভীর তত্ত্ব এদেশে প্রচারিত হয়েছে কবিতায় ও গানে। দর্শনে-সংগীতে যে বিবাদ তা এদেশে নেই। বাংলাদেশের বাউলেরা সুরে তালে যে সব গভীর তত্ত্ব গান করেছেন তা আর কোনো ভাষায় বা আর কোনো প্রকারে প্রকাশ করাই অসম্ভব। কাজেই এদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কাব্য-সংগীত পরস্পরকে আশ্রয় করে এগিয়ে চলেছে। ধর্মে ও জ্ঞানে এদেশে বিরোধ ঘটেনি। এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটলে দুঃখের আর অন্ত থাকে না।

সাধক পিতার সান্নিধ্যে থেকে ধর্মপরায়ণ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ শৈশবকাল থেকেই, সে ধর্ম পারিবারিক ব্রাহ্মধর্ম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধক জীবনের সূচনা উনিশ শতকের নব্বুইয়ের দশকে, যখন তিনি সপরিবারে জমিদারি দেখাশোনা করতে শিলাইদহে যান। লালন ফকিরের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে। রবীন্দ্রনাথ তখন ২৯ বছরের যুবক। তার কয়েক বছর পর তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য শিলাইদহ যান এবং লালনের তত্ত্বপ্রধান গানের সন্ধান পান। শিলাইদহ থেকে ছেউরিয়ায় লালনের আখড়া বেশি দূরে নয় : গড়াই নদীর এ-পার ও-পার। তখনো লালনের সান্নিধ্য-ধন্য বহু প্রত্যক্ষ শিষ্য জীবিত। তাঁদের কারও কারও থেকে বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ হয় তাঁর। লালন ফকির অন্য পল্লিকবির মতো নন, গান রচনা তাঁর উপলক্ষ মাত্র—লক্ষ্য তত্ত্বকথা প্রচার। লালনের তত্ত্বপ্রধান গানের ভাব ও ভাষা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর অন্তর্জীবনে আসে পরিবর্তন। তখনকার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁর অন্তর্জগতের পরিবর্তন সূচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লোককবিদের শাস্ত্রবহির্ভূত জীবনদর্শনকে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য মূল্য দিতেন। লালন ফকিরের উঁচু ভাবসমৃদ্ধ মরমি গান রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরবর্তী জীবনে মানবধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিল। সেটি শতাব্দীর শেষ দশক। জোড়াসাঁকোতে কিছু পারিবারিক অশান্তির কারণে তিনি তখন আত্মিক সংকটে ভুগছিলেন। শিলাইদহের মতো অজপাড়াগাঁয়ে গিয়ে তিনি যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন, তেমনি তাঁর অধ্যাত্মবাদী চেতনা সেখানে গিয়ে আরও গভীরতা ও এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। শিলাইদহ থেকে ৪ অক্টোবর ১৮৯৫ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আমার জীবনের অন্তস্থলে ক্রমশই একটা **নূতন সত্যের উন্মেষ** হচ্ছে—কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু—আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য—সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিষ হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ, এত একটা পরম লাভ।
>
> *[ছিন্নপত্রাবলী]*

এসব কথার কোনো বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ ভাষা মরমি ভাববাদীদের। এ নিয়ে তর্ক চলে না, বিশ্বাস করতে হয়।

হাজার হাজার বছর আগে সুদূর অতীতে রচিত শাস্ত্রকে তিনি অস্বীকার করেন না, সেসবের বাণীর মূল্য তাঁর কাছে অসামান্য, কিন্তু একমাত্র সেটাই জীবন ও জগৎকে জানবার জন্য যথেষ্ট নয়। অক্টোবর ১৮৯৫ সালে শিলাইদহ থেকে তিনি লিখছেন :

> আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ীর শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়, তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। মুখে যা বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারি নে। এ দিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে।
>
> *[ছিন্নপত্রাবলী]*

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান, তিনি জীবন দিয়ে জগৎকে উপলব্ধি করেন 'বর্ণ গন্ধ গীত'সমেত। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই বক্তব্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁকে দেয় অপার

আনন্দ। যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তার সঙ্গে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নেন। তিনি বলেন, 'শাস্ত্র থেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না।' শাস্ত্রের চেয়ে জীবন ও জগৎ বেশি বাস্তব ও সত্য।

প্রথাগত অর্থেও ধার্মিক রবীন্দ্রনাথ, তিনি ধর্মপ্রাণ, কিন্তু মরমি ভাবটাই তাঁর মধ্যে প্রধান। তাঁর কথায় :

> কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই; আমি আছি, আমি চলছি, আমি হয়ে উঠছি, এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি।
>
> *[ছিন্নপত্রাবলী]*

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন আলোচনা করতে গেলে বাংলার বাউল ও পল্লির ভাবুকদের চিন্তাধারা আলোচনা করা দরকার। বিশেষ করে, লালন শাহ। কারণ, বেদ-উপনিষদের শিক্ষা শুধু নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনও নয়, বাংলার লোকসংস্কৃতির ও লোকায়ত দর্শনের প্রভাবও তাঁর ওপর গভীর। নিরক্ষর বাউলদের ভাবসম্পদ থেকেও তিনি সত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। বাউলদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এতটাই ছিল যে নিজেকে 'রবীন্দ্রবাউল' বলতেও সংকোচ বোধ করেননি। ১৩২০ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে এক ধর্ম-সমাবেশে তিনি বলেছিলেন :

> বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! সে আরো গেয়েছিল : আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন সন্ধানে যাই সেখানে! তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিংবা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয়নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িকভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা, অনেক সময় দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের **মনের মানুষ** তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলেছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেছে : খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। আমার সমস্ত

সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা!—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

আরও কোনো কোনো মরমি ভাববাদী সম্প্রদায়ের মতো বাউলরাও বিশ্বাস করেন, মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা বাস করেন। কাজেই নিজেকে চিনলে, নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটাতে পারলে পরমাত্মার সান্নিধ্য অর্জন সম্ভব। বাউলদের সাধনার প্রধান বিষয় হলো আত্মার স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা। লালন বলেন :

এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ রতন।
লালন বলে পেয়ে ধন
পারলাম না চিনিতে।
ডুবে দেখ দেখি মন তারে,
কী রূপ লীলাময়—
যারে আকাশ পাতাল খোঁজ
এই দেহে তিনি রয়।

লালন ও তাঁর অনুসারীদের কাছে আত্মা ও পরমাত্মা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু জীবাত্মা তাঁকে কঠিন সাধনা ছাড়া চিনতে পারে না। তাই লালনের দুঃখ :

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম তাঁর পায়।

পরমাত্মাকে বাউলেরা আখ্যায়িত করেছেন, 'অচিন পাখি' 'মনের মানুষ' 'সোনার মানুষ' 'মানুষ রতন' প্রভৃতি অভিধায়। 'মনের মানুষে'র সন্ধান বাইরে উপাসনাগারে বসে করলে লাভ হবে না, মনের ভেতরেই করতে হবে, সেখানেই তাঁকে পাওয়া সহজ :

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর
যাবি কোথায়?
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধায়।

বাউলেরা লোকসাধক, তাঁরা ধর্মশাস্ত্র পড়েননি তা নয়, কিন্তু তা পড়ে জ্ঞানের পথে ঈশ্বরপ্রাপ্তির চেষ্টাকে বৃথা শক্তিক্ষয় মনে করেছেন। তাই বলেছেন :

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

অন্যান্য মরমির মতো বাউলদেরও ধারণা, আল্লাহ তাঁর নিজের মতন করে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। কাজেই মানুষ স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে চাইলে তার নিজের আত্মার দিকে তাকে তাকাতে হবে। লালন বলেন :

আপন সুরতে আদম গড়লেন দয়াময়
নইলে কি আর ফেরেস্তারে সেজদা দিতে কয়।
লালন বলে, আদ্য ধরম আদম চিনলে হয়।
আল্লা আর পরমাত্মা ভিন্ন ভেদে জেনো না।

স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। আল্লাহ ও মানুষের মাঝখানে আর কেউ নেই। ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে বড় নয় বলেই তাঁরা মানুষকে সেজদা বা সালাম করেন। লালন বলেছেন :

আপন খবর জানলে পরে রে,
ও রে যাবে অচেনারে চেনা।

আল্লাহকে যেহেতু চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না, সুতরাং তিনি **অচেনা**। বাউলদের সাধনা অচেনাকে চেনার, অচেনারে চেনার সাধনা রবীন্দ্রনাথেরও। লালন গেয়েছেন মানুষেরই জয়গান :

এমন মানব জনম আর কি হবে।
মন যা কত ত্বরায় কত এই ভবে।
অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই।
দেব-দেবতাগণ করে আরাধনা
জন্ম নিতে মানবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন।
তাই তো মানুষ-রূপ গড়ল নিরঞ্জন।

বাউলদের সব হেঁয়ালি বা রহস্যময় কথা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি, কিন্তু তাঁদের উদার মানবতাবাদী বাণী তাঁকে আকর্ষণ করে। মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীনের বাউল গানের সংকলন *হারামণি* (১৯৪২) প্রকাশের আগে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি বাণী প্রার্থনা করা হলে তিনি তাঁর 'আশীর্বাদ' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছিলেন :

> আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।

এ মিলনে সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে ভরা। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কথা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এমন কোনো ধর্মমতের সমর্থক ও প্রচারক যা মানুষে মানুষে ঝগড়া বাধায় না, মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়।

বাংলার বাউলদের আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন :

> বাউলরা অজ্ঞাত মর্মের অনুসন্ধান ও উপলব্ধি করিতে গিয়া, হৃদ-বিহারী অচিন পাখীকে ধরিতে চেষ্টা করিয়া অন্তরতম মনের মানুষকে মর্ম দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, দরদী সাঁই-এর প্রেমময় পরশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল তাহা বঙ্গীয় চিন্তাজগতের সম্পূর্ণ স্বাধীন পথ। এ পথ বাঙালির নিজস্ব পথ, এ পথে চলিতে চলিতে বাঙ্গালা মায়ের ভিজা মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। ...বাস্তবিকই বঙ্গের ভাবজগতে বাউলেরা চির স্বাধীনতা প্রিয় উদাস প্রকৃতির 'বেদুইন' সন্তান। তাঁহারাই বাঙালার ভাবজগতকে চিন্তার দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছিল। ...তাহাদের ভাবজাগতিক বিজয়-অভিযানের সম্মুখে কোরাণ, পুরাণ, বেদ, বাইবেল দাঁড়াইতে পারে নাই, মুহম্মদ, যীশু, কৃষ্ণ, চৈতন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন।
>
> [*বঙ্গে সুফী-প্রভাব*, পৃ.২১৫]

বাউল, লোককবি ও সুফি সাধকদের উদার মানবতাবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁদের কথা স্বীকার করেছেন।

জীবনদেবতা

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন ও ধর্মসাধনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর 'জীবনদেবতা' নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। তাঁর জীবনীলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল কাছে থেকে দেখেছেন, সুতরাং তাঁর জীবনাচরণ ও ধর্মসাধনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব বহন করে। একটু দীর্ঘ হলেও তাঁকে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে জীবনদেবতা কি ঈশ্বর হইতে পৃথক কোনো সত্তাবোধ, না—জীবনদেবতাই ঈশ্বর? এবং যদিবা তিনি ঈশ্বরই হন—তবে সে ঈশ্বরের গুণাগুণ কি কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত। অথবা তিনি কবির ঈশ্বর—কবির ভাষায় কবির সংগীতেই প্রকাশ্য। সেই অনির্বচনীয় 'পুরুষং মহান্ত'কে কবির ভাবেই দেখিলে বুঝা যাইবে, কবির ভাষাতেই জীবনদেবতার ব্যাখ্যা করি। মোহিতচন্দ্র সেনকে (৫ ফাল্গুন ১৩০৯) লিখিতেছেন :
>
> 'আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন 'আমি' আছে—যে বিশেষরূপে আমার জীবনের দেবতা—যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা—যে অতিজগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে, নানা সুখদুঃখ অনুকূলতা-প্রতিকূলকার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা—যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, **যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ**—ঈশ্বরের বার্তা, আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার পাপকে দাহন করিয়া আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যাহার অহরহ প্রয়াস, আমাকে গড়িয়া তুলিয়া যে সম্পূর্ণতা লাভ

করিবে—যাহার শক্তিতে আমি মঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর এবং আমার মঙ্গলভাবেই যাহার বলবৃদ্ধি—যে আমার বাহ্যচেতনার অন্তরালে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া গৃহিণীর ন্যায় আপন গুপ্ত ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গ্রহণ বর্জন করিতেছে তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব। তখন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে কোনো অবস্থাতেই ব্যবহিত হইয়া থাকিবেন না। আমাদের **প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্বদেবতার** সহিত আমাদের মিলনসাধনের চেষ্টা করিতেছে—নানা ঘটনা নানা সুখদুঃখসূত্রে সে সেই মিলনপাশ বয়ন করিতেছে—মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায়; আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে জটা পড়িয়া যায়, আবার সে ধীরে ধীরে মোচন করিতে থাকে—আমার সেই চিরসহিষ্ণু চিরন্তর সহচরটির সহিত এই সূর্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্র কলরবমুখর মানবসভাপ্রাঙ্গণে এই জীবনেই যেন আমার শুভ পরিণয় সম্পূর্ণভাবে সমাধান হইয়া যায়। আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করি—সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন যাই। তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি। আমার মধ্যে **আমার এই চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই** আন্তরিকতার নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তখন তাহা কিছুই জানিতাম না, এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে **পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ** বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালোবাসে, তাহার ভালোবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালোবাসা আমি লাভ করিতেছি। জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি—তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে তেমনি **আমার জীবনের দেবতা** আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি **পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক** মিলনের সেতু রচনা করিতেছে। ঠিক বুঝাইলাম কি না জানি না, বলিতে গিয়া ভুল করিলাম কি না জানি না—কিন্তু আমার কাব্যমেঘকে নানা স্থানেই বিচ্ছুরিত করিয়া এইরকমের কী একটা কথা নানা বর্ণের রশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় উদয়াচল হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি।'

[*রবীন্দ্রজীবনী*, পৃ. ৯৮-৯৯]

তিনি ও তাঁর জীবনদেবতা যেন অভিন্ন ও অবিভাজ্য। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে রচিত 'আমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন :

আজ ভাবি মনে মনে তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরাণে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা,
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা,
গণ্ডি দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু **সে আমারি আমি**
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

মরমি ভাবধারাসম্পন্ন এই কবিতায় স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের ছাপও রয়েছে। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এক অভিন্ন সত্তা—জগতের সব বস্তুতে যে স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ তা প্যানথেয়িস্টদের মতো রবীন্দ্রনাথও মনে করেন।

জীবনদেবতা ধারণাটি বস্তুবাদী দর্শনে অচল। মানুষ যেন এক অদৃশ্য খেলোয়াড়ের হাতের পুতুল। পুতুলকে যেভাবে তৈরি করা হয়, পুতুল ঠিক তাই; পুতুলকে যেভাবে নাড়াচাড়া করা হয়, সেভাবেই সে নড়েচড়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা যেন তাঁর জীবননাট্যের পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে করার চেষ্টা করেছেন। মরমি দর্শনের ব্যাখ্যাও অনেকটা মরমি ধরনের। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, যিনি রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ নিয়ে লেখালেখি করেছেন, সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন জীবনদেবতার ধারণা :

> নাটকের নির্দেশকের অভিনেতার সঙ্গে যেমন একটা প্রীতির সম্বন্ধ আছে, এবং তিনি তাঁকে কিভাবে কি অভিনয় করতে হবে শিখিয়ে দিচ্ছেন, যেমন অভিনেতা ঠিকমতো অভিনয় করেন কিনা তা দেখে তিনি সাফল্যে আনন্দ পাচ্ছেন, অসাফল্যে বেদনা পাচ্ছেন, ঠিক তেমনি জীবনদেবতা জীবননাট্যের অভিনয়েও আছেন, তার বাইরেও আছেন। তিনি ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়ে তার সহযোগিতা নিয়ে নিজের ইচ্ছাটি পূরণ করতে চাইছেন।
>
> [হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ*, কলিকাতা ১৯৮৩, পৃ.৫৭]

এ ব্যাখ্যা একজন রবীন্দ্র-অনুরাগীর—দর্শনতত্ত্ববিদের নয়। রবীন্দ্রনাথের

জীবনদেবতা প্রসঙ্গে এ-জাতীয় ব্যাখ্যা-বক্তব্যই বেশি হয়েছে। অস্পষ্ট, যুক্তির প্রয়োগ হয়েছে অল্প।

রবীন্দ্রনাথের বহু বক্তব্যে মরমি অস্পষ্টতা প্রচুর। পল্লির কবি হাসন রাজার মতো 'আমি কিছু নয় রে, আমি কিছু নয়'—এবং এই যে জীবন ও জগৎ দেখছি তার সবই সেই 'দয়াময়'—বলেছেন রবীন্দ্রনাথও। তিনি কিছু নন, তাঁর জীবনদেবতাই আসল, তিনিই তাঁকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেন, তাঁর যে রচনা তা-ও জীবনদেবতারই রচনা, তিনি শুধু একজন অনুলেখকের দায়িত্ব পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এই একটা ব্যাপার যাহার উপরে আমার কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে।...সে সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র। তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন,...
>
> [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর', *বঙ্গভাষার লেখক*, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়]

ওই যে আর-একজন 'রচনাকারী' তিনিই তাঁর জীবনদেবতা। তাঁর এই বক্তব্য পশ্চিমের যুক্তিবাদীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, এমনকি তখনো তাঁর দেশের অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাঁর এই কথায় কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের 'দম্ভ ও অহমিকা'র প্রকাশ লক্ষ করে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে।'

['রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য', *বঙ্গদর্শন*, মাঘ, ১৩১৪]

মানুষের যে বস্তুগত সত্তা, আমরা দেখি, তার বাইরেও তার একটি আধ্যাত্মিক সত্তা—Spiritual existence—থাকা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে একজন ইংরেজ লেখককে উদ্ধৃত করেন :

> Though man is essentially self-counscious, he always is more than he thinks or knows, and his thinking and knowing are ruled by ideas of which he is at first unware but which, nevertheless, affect everything he says or does...

সাধনতত্ত্ব

সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতির লক্ষ্যে যেকোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছুমাত্র আলস্য ছিল না। নিজের সৃষ্টিশীল কাজের সীমাহীন চাপ থাকা সত্ত্বেও সংঘবদ্ধ সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন। শুধু নিজে লিখে আত্মতৃপ্তি পেতেন না, অন্যকে দিয়েও লেখাতে চাইতেন, বিশেষ করে যাঁদের লেখার ক্ষমতা আছে, তাঁদের উৎসাহিত করতেন লিখতে। সে জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করেছেন তিনি।

গ্রন্থ-সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ খ্যাত ছিলেন না, সমালোচক হতে চানওনি, সেটি তাঁর কাজ নয়; কিন্তু কখনো অনুরুদ্ধ হয়ে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও দু-একটি বই আলোচনা করতেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা খুবই সংক্ষেপে। তাঁর বই আলোচনা বিশ্লেষণমূলক নয়, বর্ণনামূলক। কিন্তু তাঁর মতামত পণ্ডিতের নয়, একজন প্রাজ্ঞ পাঠকের—সুতরাং মূল্যহীন নয়। ১৯১১ সালে তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ তিনি *সাধনতত্ত্ব বিচার* নামক এক বইয়ের আলোচনায় একজন অদ্বৈতবাদীর মতোই বলেন :

> এই গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের যে আলোচনা আছে তাহাতে সকলেরই কিছু না কিছু উপকার হইবে কিন্তু যে অংশ সাম্প্রদায়িক তাহা অবিসম্বাদে গ্রহণ করা চলে না এবং তাহাতে ধর্ম্মের উচ্চ ভাবকে খর্ব্ব ও তাহার গভীর রসকে বিকৃত করিয়া দেয় এইরূপ আমার বিশ্বাস। ভগবানের লীলা সর্ব্বত্রই চলিতেছে, কোনো এক বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে ও বিশেষরূপে তাহা ঘটিয়াছে বলিলে তাঁহার অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের লীলাকে একপ্রকার অস্বীকার করা হয়। ভগবান কোনো বিশেষ

ইতিহাসের বিশেষ পত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নাই, তিনি সকল ইতিহাসের মূলে এবং তাহার সকল অধ্যায়ের সকল পাতাতে তাঁহার অনাদ্যন্ত আনন্দের কাহিনী প্রকাশিত হইয়া চলিতেছে। পৃথিবীর কোনো বিশেষ ভূখণ্ডে কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি অন্য সকল জাতিকে বঞ্চিত করেন নাই—এ প্রকার সঙ্কোচ তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অবশ্য লীলা পদার্থের মধ্যে বিশেষত্ব আছেই, কিন্তু সে বিশেষত্ব প্রত্যেক জীবের মধ্যেই। সে হিসাবে প্রত্যেক জীবেই তিনি প্রভূরূপে প্রেমিকরূপে আত্মার অন্তরতররূপে বিরাজমান। তিনি যেখানেই আছেন সেখানেই তিনি অনন্ত সম্পূর্ণ, তাঁহার অংশ নাই, আমরা যেমন নিজের দৃষ্টিশক্তির সীমাবশতঃ আকাশকে খণ্ড করিয়া দেখি তেমনি তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ণাবতার অংশাবতার এ কথা খাটেই না—তিনি সকল অংশেই পূর্ণ—আমার উপলব্ধি যতই পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে আমার মধ্যে তাঁহার আনন্দও ততই পূর্ণ করিয়া ভোগ করিব—তাহাতে আমারই ভোগ বাড়িবে, কিন্তু তাঁহার ভোগ সম্পূর্ণ হইয়া আছে।

[প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২২৮]

এ বক্তব্য যদিও একজন অবিচল অদ্বৈতবাদীর এবং এ ধারণা একজন একেশ্বরবাদীর, তবে অন্ধ সাম্প্রদায়িক একেশ্বরবাদীর নয়। রবীন্দ্রনাথ সেই একেশ্বরবাদী যিনি মনে করতেন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেমন এক ও অখণ্ড, তেমনি তার অধিপতি পরমসত্তাও অখণ্ড, তাঁকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী যতই খণ্ড খণ্ড করে দেখার চেষ্টা করুক না কেন।

বাংলা ভাষায় এত অমূল্য গ্রন্থ থাকতে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন একজন অখ্যাত লেখকের বইটি আলোচনা করার জন্য এবং নিজেই আলোচনার জন্য নির্বাচন করেন, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। গ্রন্থকার নন, গ্রন্থটি নয়, তাঁর পছন্দ হয়েছিল বইটির বিষয়বস্তু। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের জীবনদর্শন এবং ব্রহ্মভাবনা প্রকাশ করেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় বিষয়। তাঁর চিন্তাজগৎ ও ধর্মজীবন বৈষ্ণব দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রেমময় ও প্রেমস্বরূপ।

মানবপ্রেমমূলক ও ভক্তিমূলক উদার বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি আগ্রহের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ 'বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বকে তাঁর সমকালীন মানসিকতার অনুকূলে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেওয়ার জন্যই তিনি গ্রন্থটি আলোচনা করার দায়িত্ব' নিয়েছিলেন। তবে তাঁর উদার ও একেশ্বরবাদী

ব্যাখ্যা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথের আলোচনাটি পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে একজন বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন :

> ঠাকুর মহাশয় ঠাকুর মানেন না; ভগবান মানেন, অবতার মানেন না, অনন্ত লীলা মানেন, সান্ত লীলা মানেন না। বলি, নিজের লীলাও মানেন না কি।
>
> ['রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ' [১৩১৮], *রবীন্দ্রবীক্ষা*, পৃ.১০
> *রবিজীবনী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.২২৯]

অনগ্রসর ও ধর্মান্ধ মানুষের সমাজে অগ্রসর, উদার ও যুক্তিশীল চিন্তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতও তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের কাছেই অনেক সময় অগ্রহণীয় ও উপেক্ষিত হয়েছে।

সুফিবাদে সিক্ত

বৈষ্ণব ধর্মদর্শন ও সহজিয়া মতবাদের মতো সুফিবাদেও রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল। নিজে ছিলেন একজন প্রায়-সুফি, যদিও আক্ষরিক অর্থে নয়। প্রভাবিত ছিলেন পারস্যের প্রাচীন সুফি কবিদের দ্বারা। প্রবাসীর সহসম্পাদক ও লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৪ আষাঢ় ১৩১৮ (২৯ জুন ১৯১১) এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হেমলতাকে দিয়ে আমি সুফিধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড বড় বই তর্জ্জমা করাচ্ছি।' বইটি হলো মুহম্মদ-ই-সোহরাওয়ার্দীর 'আবারিকুল মআরিফ'। অনুবাদের প্রথম কিস্তি *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-য় 'সুফী ধর্ম্মমত ও সাধনা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তিনি তখন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পাদনা করতেন। প্রবন্ধটির পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> সুফী ধর্ম্মের সমস্ত বিধি-বিধান ইহার সাধনপদ্ধতি আলোচনা ও সংগ্রহ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফী সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত গুরু মহম্মদ-ই-সর্‌বর্দ্দি অবারিকুল মআরিফ নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহারই ইংরেজি অনুবাদ হইতে আমরা সারসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণ আমাদের দেশের প্রচলিত সাধনপদ্ধতির সহিত অনেক ঐক্য দেখিতে পাইবেন। এ সম্বন্ধে সুফীদের সহিত ভারতের ভক্তদের যে আদানপ্রদান ছিল তাহা ঐতিহাসিকদের আলোচ্য।
>
> *[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৮, পৃ.৩৫১]

হেমলতা দেবী (১৮৭৩-১৯৬৭) কে ছিলেন তাঁর সামান্য পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি ছিলেন দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী। দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথম স্ত্রী সুশীলা দেবীর মৃত্যুর পর তিনি ঠাকুরবাড়িতে বউ হয়ে আসেন। রামমোহন রায়ের পুত্র

রাধাপ্রসাদ রায়ের মেয়ের ঘরের নাতনি ছিলেন তিনি। রামমোহন-বংশের মেয়ে হওয়ায় ঠাকুর-পরিবারে তাঁর ছোটবেলা থেকেই আসা-যাওয়া ছিল। সুশীলা দেবী দুটি শিশুসন্তান রেখে মারা গেলে তাঁকে দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী করে আনা হয়।

রামমোহনের বংশধর হওয়ায় এবং দেবেন ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে অশৈশব যোগাযোগ থাকায় তিনি ছিলেন অন্যরকম সংস্কারমুক্ত মানুষ। ধর্মীয় চেতনা তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। তাঁর অগ্রজ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯৩৬) পেশায় আইনজীবী হলেও উনিশ শতকের থিওসোফি আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। থিওসোফি আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্লাভাটস্কির বিশেষ সচিব হয়ে তিনি ১৮৮৩ সালে ইউরোপে যান। তিনি আধ্যাত্মিক গুরু পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অনুসারী ছিলেন। তাঁর গুরুর সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে আরও কয়েকটি বইও লিখেছেন। তার মধ্যে ইংরেজিতে *ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি* ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা-বিষয়ক। তাঁর সহোদরা হিসেবে হেমলতা দেবী পারিবারিক দিক থেকে উদার ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, ঠাকুরবাড়িতে এসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার সুযোগ আরও বাড়ে। দ্বিপেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর 'কয়েক বৎসর শ্বশুরের সেবা লইয়া দিন কাটে,' বলে জানিয়েছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, 'রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য অনুবাদাদি করিয়া দিতেন'।

ইংরেজি ও বাংলা তিনি ভালোই লিখতে জানতেন। কারণ, তিনি ছিলেন একজন 'বিদ্যোৎসাহিনী'। 'ব্রাহ্মণের মতোই হেমলতার ধারণাশক্তি ছিল' প্রখর এবং '...দাদা মোহিনীমোহনের কাছে তিনি পড়েছিলেন 'কালীসিংহির মহাভারত'। রবীন্দ্র-অনুরাগী পিয়ার্সন ও এন্ড্রুজের কাছে ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন। তা ছাড়া 'হেমলতা পড়তেন রবীন্দ্রনাথের কাছেও। কবি দেশবিদেশের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ভালো ভালো প্রবন্ধ বেছে নিয়ে হেমলতাকে অনুবাদ করতে দিতেন।'

[চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, পৃ.১২২]

জোড়াসাঁকোর বাড়ির সবার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। কারও কারও সঙ্গে ছিল বেশি ঘনিষ্ঠতা। আধ্যাত্মিক বিষয়ে চর্চা করতে গিয়েই হেমলতা দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বিষয়ে তিনি হয়ে ওঠেন কবির একজন সঙ্গিনী। ঠাকুরবাড়ি-বিষয়ক একজন লেখিকা জানান :

> রাজা রামমোহনের ঐতিহ্য তো ছিলই, বিয়ের পরে এর সঙ্গে যুক্ত হল মহর্ষির জীবনসাধনা। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি কিছু সুফীবাদের বইও পড়েন। অনুবাদ করেন 'আফ্রিকায় ইসলাম' প্রবন্ধটি। সেটি পড়ে একদিন কবি পড়াতে পড়াতে বলেন, 'তুমি মুসলমান হবে নাকি? তোমার মন যে রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দেখি, সুফীদের কথায়।'
>
> হেমলতা তখন নতুন বউ নন। তাই বললেন, 'সুফীরা মহাতাপস, তবে কোনও কিছু হওয়া হওয়ি চলবে না রাজা রামমোহন যুগে। কোনও একটা কোঠায় ঢোকা যায় কী করে?'
>
> কবি শুনে খুশি হয়েছিলেন, 'কথা ঠিক। তোমার ওপর রাজা রামমোহনের আশীর্বাদ আছে দেখছি।'
>
> [*ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*]

একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মের প্রতি হেমলতার অসামান্য অনুরাগ ছিল। হজরত মোহাম্মদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভক্তি। ওই লেখিকা আরও জানান :

> পরবর্তীকালে ইউরোপে যাবার সময় দূর থেকে আরবের রাজ্য দেখে হেমলতা সেই মাটি স্পর্শ করবার জন্যে আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন এই ভেবে যে 'এইখানে পয়গম্বর মহম্মদ জন্মেছিলেন, তাঁর জীবনলীলার সব কিছু এইখানেই ঘটেছিল—অবসানও হয়েছিল এই মাটিতে, তাঁর দেহের অণু পরমাণু এখনও হয়তো এই মাটিতে মিশে আছে।' প্রতিটি ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে।
>
> মহর্ষির আশীর্বাদও পেয়েছিলেন হেমলতা। বলেন্দ্রের মৃত্যুর পর পারিবারিক ধর্মালোচনার সময় তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং পৃথক ধর্মসাধনার কথা মহর্ষি শুনতে পান ও হেমলতার সঙ্গে প্রতিদিন দুপুরে একঘণ্টা ধর্মালোচনা করতে আরম্ভ করেন। এভাবেই কাটে দীর্ঘ সাত বছর। হেমলতার আগ্রহ ও যুক্তি দেখে তিনি তাঁকে হোম করবার অনুমতিও দিয়েছিলেন। কারণ এই হোম শুধু অগ্নিপূজা নয়। সক্রিয় ব্রহ্মশক্তিতে সর্বশক্তিমান পরমাত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি করার জন্যই এই অগ্নিসাধনা।
>
> [চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, পৃ.১২২]

হেমলতার সঙ্গে একটি অবাধ প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের। চিঠিপত্রেও তিনি তাঁকে মনের কথা জানাতেন। বলতে গেলে হেমলতা ছিলেন বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সহযোগী। নিজের কথা তাঁকে জানিয়ে মনের ভার লাঘব করতেন। ১৫ কার্তিক ১৩১৮, শিলাইদহ থেকে এক চিঠিতে তিনি হেমলতাকে লেখেন :

> এ জায়গাটি বেশ ভালো লাগছে—নির্জনে ভালো থাকব বলেই মনে হচ্ছে—পদ্মায় শরীরও ভালো থাকবে। যেমন করে হোক নিজের গর্তটার

ভিতর থেকে **নিজের নির্মল বিশুদ্ধ সত্তাটিকে** বাহির করে আনতেই হবে। ...[যদি] আপনাকে সকল বাধামুক্তভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে না পারি তা হলে বুঝব আমার এ জীবনের ভিতরকার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে, এটাকে বদলে ফেলে আবার নতুন বাহন জুততে হবে—।

শেষের কথাটি স্পষ্ট নয়, আবেগের কথা। এর মাত্র চার দিন পর ১৯ কার্তিক লিখেছেন, 'নিজের মধ্যেই বেড়া দিয়ে আমি কখনোই টিকতে পারব না—চিরদিনই ঘোর বন্ধনদশার মধ্যেও আমার চিত্ত কেবলি মুক্তিকে চেয়েছে—সেই মুক্তিকে হারিয়ে আমি কি একেবারে ব্যর্থ হয়ে চলে যাব? কখনোই না।'

কয়েক দিন পর আবার লিখছেন, 'নিজের বাইরের আবরণ বেষ্টন ভেদ করে **আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে** লাভ করবার জন্যে মনে ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছে না। কেবলি বলছে, বেরোও বেরোও—না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার—আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন।'

ওই সময় রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ যাত্রার আয়োজন চলছিল। পশ্চিমে যাত্রা শুরু করার আগে নিজের মধ্যে এক ভারী পাষাণের দুর্বোধ্য ও দুঃসহ ভার বোধ করছিলেন কবি এবং এক অস্বাভাবিক অস্থিরতা কাজ করছিল তাঁর মধ্যে। নিজের ভেতর অজানা মহৎ কিছুর উন্মেষ উপলব্ধি করছিলেন। তাই একই চিঠিতে তিনি লিখছেন :

> ...আর যেন আর সহ্য করতে পারছি নে—বেরোও, বেরোও, বেরোও—সমস্ত অসত্য থেকে সমস্ত স্থূলতা জড়ত্ব থেকে বেরোও, বেরোও—একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো—আর নয়—আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়—কোথায়, ভূমা কোথায়—কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার।
>
> [*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ. ১-৩]

হেমলতাকেই এসব কথা বলার কারণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর উদার মতবাদগুলো পর্যালোচনা করতেন হেমলতা এবং তাতে উৎসাহ দিতেন শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, প্রথম দিকে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথও। সুফিতত্ত্বে এবং শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে অপ্রথাগত ধর্মমতের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। এক লেখক জানান :

> যাদের সংস্পর্শে এসে তাঁর জীবন ধন্য হয়ে উঠেছিল, সেই স্পর্শমণির মতো কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রবন্ধের মধ্যে ধরে রেখেছেন হেমলতা। না রেখে

পারেননি। স্মৃতিকথার ছোঁয়া থাকলেও এই প্রবন্ধগুলো লেখবার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অপরিচয়ের দূরত্বে সরিয়ে রাখার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর', 'বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ', 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ', 'আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখীন সাধনার ধারা'—কবিকে বুঝতে খুব বেশি সাহায্য করে। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন 'রচনাগুলি অতি সুপাঠ্য'।

[চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, পৃ.১২৬]

দেবেন্দ্রনাথ হেমলতাকে তাঁর স্নেহের চিহ্ন হিসেবে একটি আংটি উপহার দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে কয়েকটি বইও হেমলতা লিখেছিলেন। যেমন— *পরমাত্মার কি প্রয়োজন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা কাহার নাম, চৈতন্যময় পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কাহার নাম, সত্য লাভের উপায় কি* প্রভৃতি। ঈশ্বরপ্রেম-বিষয়ক কয়েকটি কবিতার বইও রয়েছে হেমললতার : *জ্যোতি, অকল্পিতা, আলোর পাখী* প্রভৃতি। তিনি ছিলেন একজন সাধক নারী। ধর্মসাধনার বিষয়ে নিয়োজিত থাকতেন সব সময়।

মুসলিম সুফিদের সঙ্গে হিন্দু প্রেম ও ভক্তিবাদীদের বহু ব্যাপারে মিল ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> ...প্রথম সংঘাতের পরে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী ও বিদেশী-মিশ্র মুসলমান এবং দেশের হিন্দু বাঙ্গালী জন-সাধারণের মধ্যে একটি সংস্কৃতি-বিষয়ক সহযোগিতা আরম্ভ হইল; মুসলমান সুফী, দরবেশ, ফকীর ও গাজী ধর্ম-প্রচারের জন্য উত্তর-ভারত হইতে এবং কচিৎ ভারতের বাহিরে হইতেও বাঙ্গালায় আসিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততার ফলে হিন্দুদের অনেককে বল-পূর্বক মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে; তবে পীর, ফকীর, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতির ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তি অর্থাৎ কোরান-অনুসারী ইসলাম নহে। **শরিয়তি মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে** [কথাটি সম্পূর্ণ ভুল]; বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সুফী মত-ই বেশি প্রসার লাভ করে। সুফী মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল; মধ্য-যুগে তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর [হিন্দুরদের] পক্ষে সহজ-

গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজম উ-ল-বহরৈন' অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল হক বঙ্গদেশে ইসলাম-প্রচার বিষয়ে যে মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির একটা প্রধান দিকের ইতিহাসের উপর লক্ষ্যণীয় আলোকপাত দেখিতে পাইব।

[পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.৩৬]

মুহাম্মদ এনামুল হকের *History of Sufism in Bengal* বঙ্গের সুফি মতবাদ সম্পর্কে একটি অসামান্য কাজ। ওই পিএইচডি গবেষণার ভিত্তিতেই বেরোয় তাঁর *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (১৯৩৫)। তাতে বাংলাদেশের বিভিন্ন তরিকার সুফিদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ওই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত। ড. হক তাঁকে বইটি উপহার দিয়েছিলেন। *বঙ্গে সুফী প্রভাব* পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সে কথা ড. হক চট্টগ্রামে তাঁর বন্ধু খান বাহাদুর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে (খ্যাতিমান বিজ্ঞানী প্রফেসর ইমেরিটাস ড. জামাল নজরুল ইসলামের বাবা) এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন। সুফি মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধার কথাও রবীন্দ্রনাথ এনামুল হককে জানিয়েছিলেন।

ইসলামি ও ইসলামের বাইরের নানা মতের ও নানা পথের বিচিত্র বিশ্বাসের নির্যাস হলো সুফিবাদ। সুফিদের সাধনার পথ একরৈখিক নয়, বিচিত্র। কোনো একটি নির্দিষ্ট মত ও বিশ্বাস মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না বলে তাঁরা মনে করেন। বিচিত্র বিশ্বাসের এক সর্বোচ্চ অধ্যাত্মকরণ সুফিবাদে সম্ভব। সে জন্য গভীর ঈশ্বরপ্রেমমূলক সুফিবাদ রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছিল।

মুসলিম দর্শন, বিশেষ করে ইসলামি সুফিবাদী দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জানার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে তা নিয়ে আলোচনা করার মতো নির্ভরযোগ্য মানুষ তিনি বিশেষ পাননি। মাঝে মাঝে ইসলামি দর্শন নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের থেকে শুনতে চাইতেন এবং তা নিজের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী আবদুল আহাদ তাঁর, যিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র, স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০...গান্ধীজী চলে যাওয়ার দুদিন পরে আলীগড়ের দর্শনের প্রফেসর হাদি হোসেন এলেন শান্তিনিকেতনে। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে গেলাম, প্রফেসর হাদি হোসেন মিষ্টিসিজম ইন ইসলামের উপর বক্তৃতা

করলেন, চমৎকার বললেন। বলার ভঙ্গি খুবই সুন্দর এবং দর্শনকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন, কবিগুরুও উপস্থিত ছিলেন।

বহু মনীষীর মতো রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র বিশ্বাসে ও মতবাদে সব সত্য রয়েছে—তা মনে করতেন না। সত্যকে কোনো একটিমাত্র সূত্র থেকে জানা যাবে নয়, একাধিক সূত্র থেকে জানতে হবে। তাই তিনি বিভিন্ন মত ও বিশ্বাস জানতে ও শুনতে চাইতেন। বিভিন্ন মতের মধ্যে যে মতটি অপেক্ষাকৃত বেশি সত্যের সন্ধান দেয়, সেটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করতেন তিনি। সংস্কারের বশে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মতকে বেশি মূল্য দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার উপকরণ অনুসন্ধান করেছেন রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষক আবু সয়ীদ আইয়ুব। তিনি লিখেছেন :

> আমাদের পরিচিত মরমিয়া-সাধকরা কিন্তু প্রায় সবাই একই সাধনমার্গ ধ'রে ঈশ্বরের দিকে এগুতে প্রয়াসী হয়েছেন সমস্ত জীবনভরে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনা ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণা মার্গ থেকে মার্গান্তরে চ'লে গেছে একাধিকবার—এক ধর্মসমাজ থেকে আর-এক ধর্মসমাজে, তারপর একলা পথে কখনো মগ্ন হ'তে চেয়েছেন ব্যক্তিস্বরূপ জীবনস্বামীতে, কখনো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বজাগতিক সত্তা অর্থাৎ ভূমাতে, কখনো দীক্ষা নিতে চেয়েছেন নটরাজ শিবের কাছে, কখনো চিরমানবের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন, কখনো অমৃতভরা মুহূর্তে ধরতে চেয়েছেন শাশ্বতকালের মহিমা। এমন বৈচিত্রময় অথচ প্রত্যেকটি সাধনায় নিবিষ্টপ্রাণ সাধনের দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।
>
> [*পাঁচজনের সখা*, পৃ.৯]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সঙ্গে সুফিসাধকদের জীবনযাপনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সুফিই যেমন জীবন ও জগতের ব্যাপারে উদাসীন, তিনি তা ছিলেন না। সংসারধর্মই যে নিখুঁতভাবে পালন করতেন তা-ই নয়, সামাজিক কর্মেও তিনি নিজেকে রাখতেন গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু তাঁর সবও সময়ের অবশিষ্টটুকু বরাদ্দ রেখেছেন একেবারেই নিজের জন্য, ধর্মসাধনার জন্য।

সুফিবাদ ইসলামের ভেতর থেকেই এসেছে, ইসলামেরই একটি মরমি ধারা বা শাখা। হজরত মোহাম্মদকে অনেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 'সর্বপ্রথম সুফি' মনে করেন। কারণ, তিনি স্রষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে স্বতঃপ্রণোবৃত্ত হয়েছেন। তিনি দারিদ্র্য বরণ করে দীনের মতো জীবনযাপন, খোদাপ্রেম,

খোদাভজনা, মানবপ্রেম, মানবসমাজ পুনর্গঠনে কর্মসূচি দিয়েছেন। কোরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি একজন মানুষ এবং কোনো অলৌকিক ব্যাপার ঘটানোর জন্য হজরত মোহাম্মদ আসেননি। তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল মানুষকে সৎ পথে পরিচালনার জন্য। কোরআনের বাণী ঐশী বা এক অতিপ্রাকৃত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হলেও মূলত তা যুক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ—এ সবের সঙ্গেই বিশেষভাবে যুক্ত।

কথাটি প্রাসঙ্গিক মনে না-ও হতে পারে, কিন্তু ভেবে দেখার বিষয় যে, রবীন্দ্রনাথ যে পোশাক পরতে ভালোবাসতেন, তা উপমহাদেশের বা বঙ্গের একজন সাধারণ হিন্দু ভদ্রলোকের পোশাক নয়—একজন সুফিরই পোশাক। পশ্চিমি প্যান্ট-শার্ট-কোট নয়, স্থানীয় ধুতি-চাদরও নয়—কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখাল্লা। কখনো বা মাথায় উঁচু পশমি তুর্কি টুপি। এর মধ্যে হিন্দুআনা কোথায়? অচেনা কেউ তাঁকে দেখলে সুফি মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। ইরান সফরের সময় সেখানে অনেকে তাঁকে সুফি দরবেশই মনে করেছেন।

বৌদ্ধ মানবতাবাদ ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে

বৌদ্ধ মানবতাবাদ ও বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জানার আগ্রহ ছিল অল্প বয়স থেকেই। তার জন্য তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছ থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বললেন, তিনি জীবনে দুটি পণ্ডিত দেখেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর বড়দাদা [দ্বিজেন্দ্রনাথ]...'।

[*সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ.৬]

তাঁরা উভয়েই ছিলেন প্রাচীন ভারততত্ত্বে পণ্ডিত। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বৌদ্ধদর্শনে পণ্ডিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ হিন্দুদর্শনে পণ্ডিত। অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসবিদ ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্পর্শে আসেন। মিত্রও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। *জীবনস্মৃতি*তে তিনি রাজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে লিখেছেন :

> এ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক বড়ো বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।

রাজেন্দ্রলালের প্রতি তাঁর এতটা শ্রদ্ধার কারণ কী? একসময় তাঁর কাছে তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন। সুকুমার সেন লিখেছেন :

> বৌদ্ধসাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের প্রকৃত শিষ্য বলতে যদি কেউ থাকেন তো রবীন্দ্রনাথ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো রাজেন্দ্রলাল-দীক্ষিত শিষ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়ে ভালো গবেষণা করেছেন জানি। কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে যে সাহিত্যরস আছে তার নিষ্কর্ষ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করতে পারেননি, না এদেশে, না বিদেশে। সুতরাং 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'র জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা কিঞ্চিৎ অংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাপ্য।
>
> [সুকুমার সেন, *পরিজন-পরিবেশ রবীন্দ্র-বিকাশ*, পৃ.৩৪-৩৫]

মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি এখানে হলেও তা বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এশিয়ার অন্যান্য দেশে। বৌদ্ধধর্ম-অধ্যুষিত প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ রবীন্দ্রনাথ ব্যাপক ভ্রমণ করেন। সেসব দেশে তিনি বৌদ্ধ সভ্যতার ও বৌদ্ধ দর্শনের আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাতে বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব ও মানবতাবাদী দর্শনের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। বৌদ্ধধর্মের মানবীয় দিকটি তিনি পছন্দ করতেন। তিনি লিখেছেন :

> ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।
>
> ['মন্দির', *বিচিত্র প্রবন্ধ*, 'বুদ্ধদেব', পৃ.৪৮]

বুদ্ধদেব ছিলেন দুঃখ-দুর্দশাময় এই জগতের এক মুক্তিকামী মহামানব। তিনি মানবজীবনের দুঃখের কঠিন রূপটির প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেননি জীবন দুঃখময়। তাঁর কাছে এই জগৎ আনন্দময়। তিনি অবিচলভাবে বিশ্বাস করেন :

> উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবনের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা।
>
> ['চিরনবীনতা', *শান্তিনিকেতন*, ২য় খণ্ড]

বুদ্ধদেব করেছেন দুঃখময় জগতে মানুষের মুক্তির সাধনা, খুঁজেছেন সীমাহীন দুঃখ-বেদনা থেকে মুক্তির উপায়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের আনন্দ-রসে আপ্লুত। জগতের মূলে আনন্দময়, মঙ্গলময় এক পরম পুরুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অবিচল। বুদ্ধের কাছে পরমার্থ-বিষয়ক ভাবনা অর্থহীন। সংসারে যা কিছু আকর্ষণীয় ও সুখকর, স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি যা মানুষকে মুগ্ধ করে, সেসবকে বুদ্ধদেব বলেছেন বন্ধন। ধন-সম্পদ, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি প্রাপ্তির যে তৃষ্ণা, সেই তৃষ্ণাই মানুষের সব দুঃখের কারণ; তাকে অগ্রাহ্য করার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ তার বিপরীত। স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার মধ্যেই তিনি পেয়েছেন মুক্তির স্বাদ।

বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের তত্ত্বকথা আলোচনা করা এক জিনিস, তা বাংলা ভাষায় বহু লেখক করেছেন, কিন্তু বৌদ্ধদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া আরেক কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধধর্মতত্ত্বের 'ব্রহ্মবিহার'-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্মবিহারের আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছে।

ব্রহ্মলোকে যাওয়ার উপায় বা মার্গকে বলা হয় ব্রহ্মবিহার। তাতে রয়েছে চার রকম ভাবনা: মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা। ব্রহ্মকে চাওয়াই সবচেয়ে বড় চাওয়া ও পরম লক্ষ্য—সে কথা বুদ্ধদেব বলেননি। কিন্তু ঔপনিষদিক ব্রহ্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারকে মিলিয়ে দেখেছেন। ব্রহ্মবিহারের মৈত্রীভাবনা হলো সর্বলোকের সব প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।
>
> ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।
>
> ... ...
>
> অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্র ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।
>
> ['ব্রহ্মবিহার', *বুদ্ধদেব*, পৃ.২০-২১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক স্নেহভাজন শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবক যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে (উজিরপুর, বরিশাল ১৮৮৮-১৯৬৮) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ এক চিঠিতে লিখেছিলেন:

> শীল সাধন সম্বন্ধে তুমি যে চেষ্টা করচ সেটা আমার কাছে ভাল বোধ হচ্ছে। একে একে একটু একটু করে মনটা পরিষ্কার করে না ফেল্লে অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয় না। কিন্তু বুদ্ধদেব যে কয়টি শীল ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তাই এখন চলবে না—নিজের চিত্তের মধ্যে অবগাহন করে নিজের হৃদয়ে যে যে গ্রন্থি আছে বিশেষভাবে সেইগুলি একে একে মোচন করবার চেষ্টা কোরো। [নিম্নরেখ রবীন্দ্রনাথের]...
>
> মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—সাধনমন্ত্র-ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি ত জানিনে। যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম শান্তম্

শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো—ঐ কথাগুলো যেন তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে।'

[শারদীয় *দেশ*, ১৪১৮, পৃ.৪০-৪১]

যতীন্দ্রনাথকেই ২৩ মে ১৯১১ আরেক চিঠিতে যা লিখেছিলেন, তাতে বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁর ধারণার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে :

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কি সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়—কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালবাসার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে, বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে আনন্দের দিকে নয়—এই জন্যই অহংকে নির্ব্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। ...অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ একমুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ঐ প্রকৃতি—সে যে, যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্ব্বাপিত করতে হয় এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চারদিকে ভিড় করে আসত না।

[শারদীয় *দেশ*, ১৪১৮, পৃ.৪১]

বুদ্ধদেব সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন রচনায় তাঁর মতামত লিখেছেন। দার্জিলিং সফরের সময় বুদ্ধদেবকে নিয়ে কবিতাও তিনি লিখেছেন :

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালি ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে,
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরার জন্ম নিয়ে যে মহামানব

সব মানুষের জন্ম সার্থক করেছে একদিন
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়নী ও ধরণী।
যার আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহুযুগ

যাহাতে প্রত্যক্ষ গেলো ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়
শুভক্ষণে পুনমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে
প্রবেশি মানবলোক আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যত্যাগী হয়েছি আমি ॥

['জন্মদিনে', ৬ সংখ্যক কবিতা, (মংপু, বৈশাখ ১৩৪৭)]

বুদ্ধের শিক্ষা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বলেই ভারত থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বৌদ্ধধর্ম। যা ভারতের মানুষের জন্য সত্য ছিল তা অন্য দেশের জন্যও সত্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়-ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু **সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই**। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এশিয়াকে অধিকার করল। **চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই**।

[বিশ্বভারতী-৪]

ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বকে মানবতার বাণী শুনিয়েছিল। কিন্তু তারপর সেই ভারতবর্ষেই এল অনৈক্য ও বিভেদের সামাজিক ব্যাধি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে।

['ব্যাধি ও প্রতিকার', *সমূহ*, ১৯০৭]

কালপ্রবাহে বৌদ্ধ মানবতাবাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় ভারতবর্ষের মানুষের ক্ষতি হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কালক্রমে বুদ্ধের অহিংসার দর্শনের স্থান দখল করেছে হিংসা। তাতে ব্যথিত হন তিনি :

বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে।...ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

[*বুদ্ধদেব*, পৃ.৮-৯]

হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—দুই-ই ভারতবর্ষের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও দর্শন আলোচনা করতে গেলে তাঁর বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও বৌদ্ধ মানবতাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিবেচনা করতেই হবে।

মানবপন্থী বাংলাদেশ

হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলোতে যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাসের কোনো অভাব ছিল না, তবু শাস্ত্রনিরপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী তত্ত্বজ্ঞানই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। কারণ ওইসব তত্ত্বজ্ঞানের বাহন ছিল কবিতা ও সংগীত। সেগুলো রচিত হতো সাধারণ মানুষের ভাষায় এবং তা সহজেই স্পর্শ করত সাধারণ মানুষকে। তাই তাঁর মতে, ভারতবর্ষে দর্শন শুধু পণ্ডিতদের সম্পদ নয়, সাধারণ মানুষের প্রিয় বস্তু ও চর্চারও বিষয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> যখন দেখি যে তাহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সংগীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নরনারীর আদরের ধন, তখন বুঝিতে পারি দর্শন বস্তুটি কি গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্নচৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে। এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।
>
> [ভারতীয় দর্শন সভায় সভাপতির ভাষণ, ১৯২৫]

ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা হিন্দুদর্শনের চর্চা করতেন, যেমন—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২) প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক দার্শনিক ও দর্শনের অধ্যাপকদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অসামান্য উৎসাহ ছিল। উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে জীবন ও জগৎ নিয়ে, দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। ক্ষিতিমোহন সেন, ঠিক কোন সময়টিতে তা তিনি বলেননি, লিখেছেন :

...একদিন সন্ধ্যাবেলা আলোচনা চলছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও জ্ঞানমূর্তি ব্রজেন্দ্র শীল এই দুইজনের মধ্যে। আমরা দুইএকজন ভাগ্যক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

মানবতত্ত্বসম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের একটি গভীর আলোচনার পরে কবিগুরু বলছিলেন, 'আমাদের দেশে সব কথাতেই স্থান-কাল-পাত্রের বিচার। এর মধ্যে মানুষই হল পাত্র। প্রত্যেকটি পাত্রেরই আপন আপন বিশেষত্ব আছে। বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালেরও কি এইরূপ এক-একটি বিশেষত্ব নেই? আমার তো মনে হয় এক যুগ অন্য যুগ হতে রীতিমতো বিভিন্ন। বিচার করে দেখলে পৃথিবীর সর্বদেশেই সেই যুগের কালগত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। আবার প্রত্যেকটি যুগেরও দেখা যায় দেশগত একটি বিলক্ষণতা। নূতন পুরাতন সব যুগেরই সেই দেশের সেই বৈশিষ্ট্যটিকে এড়িয়ে যাবার জো নেই।'

ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্যটি কি?'

কবিগুরু বললেন, 'বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের যোগদৃষ্টি ও ঐক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ ধর্ম। আমার 'ভারতের ইতিহাসের ধারা'তে আমি একথা ভাল করেই বলেছি। ভারতের উঁচু নিচু বহু ধর্ম ও সংস্কৃতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায়নি। এইটি আর কোথাও কি দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি দুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ভারতে কিন্তু সেটি কখনোই ঘটেনি। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির (harmony) সাধনাই হলো ভারতের বিশেষ সাধনা। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতের ব্রত। যে সব সাধক এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ। তাঁদের নামই আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বড় বড় যুদ্ধে রণজয়ীদের কথা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ কবীর রবিদাস নানক চৈতন্য প্রভৃতির কথা আমরা কখনও ভুলতে পারিনে। বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় ভারত-পন্থ, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ ভারতপথিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ।

বীণাতে সরু-মোটা চড়া-খাদ নানা সুরের বহু তার রয়েছে। তার মধ্যে একটাও তো বাদ দিলে চলে না। কলারসিকের হাতে সব তারের সব সুর মিলিয়েই পরিপূর্ণ সংগীত বীণায় বাজে। **ভারতও যেন একটি বহুতন্ত্রী বীণা।** এখানে নানা সাধনার সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ সমবেত সংগীত জাগিয়ে তোলাই হলো ভারতের মহাপুরুষদের সাধনা। এমনটি তো আর কোথাও দেখা যায়না। এই হল ভারতের বিশেষত্ব।

কাজ সহজ করবার জন্য যাঁরা ভারতের এই অপূর্ব বহুতন্ত্রী বীণার নানা বৈচিত্র্যকে জোর করে নিঃশেষ করে এই সবৈশ্বর্যময়ী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করে ফেলতে চান তাঁরা ভারতের সেই মহাধর্ম হতে ভ্রষ্ট। এই বিশেষত্বকে হারালে স্বধর্মভ্রষ্ট ভারতের আর রইল কি? বিধাতা ভারতের গৌরবময় এই মহাসাধনাকে এমন সহজ করেননি বলেই ভারতের এত দুঃখ এত বেদনা। ভারতের যথার্থ মহাপুরুষেরা এই বিপদ এড়িয়ে সস্তা সহজ পথ যে দেখাতে যাননি সেটাই আমাদের মহাভাগ্য। সুলভ পথের দুর্গতি যেন আমাদের পেয়ে না বসে। তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ভারতের আর কিছু নেই।

[ক্ষিতিমোহন সেন, *বাংলার সাধনা*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৭১, পৃ.৫-৬]

বাঙালির জীবনসাধনা ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মানুষের থেকে আলাদা। শাস্ত্রের কড়াকড়ি বাঙালি সাধকদের ভালো লাগেনি। তাঁদের পছন্দ সমন্বয়ী মানবপন্থী ধারা। বাঙালির 'মানবপন্থী' বা মানবতাবাদী দর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও বিবেচনা খুবই স্পষ্ট। সেদিন বিশ্লেষণমূলক দার্শনিক ধারা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতিমোহন লিখেছেন :

ভারতের পরই এল বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু বললেন, 'নদীর পলিমাটিতে তৈরি এই বাংলাদেশ। এখানে ভূমি উর্বর। বীজমাত্রই এখানে সজীব ফসল হয়ে ওঠে। তাই এখানে প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। পলিমাটির দেশ বলেই এখানকার ভূমি কঠিন নয়। তাই পুরাতন মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতির গুরুভার এখানে সয় না। সেই সব গুরুভার এখানে ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশে তাই তীর্থ প্রভৃতি বেশি নেই। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। তাকে দুর্ভাগ্য বলব কি সৌভাগ্য বলব?

বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবনসাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশি করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বরভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হতে পারবে না। পুরাতনের মৃত পাষাণভার এখানে না সইলেও জীবনের দাবিদাওয়া এখানে পুরোপুরি সফল হবে।

এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলনযুগের প্রারম্ভেও তাই বিধাতার প্রথম দাবি এল এই বাংলাদেশে। বড় দুঃখের সেই আবেদন। তাই রামমোহন এদেশে পেলেন নির্যাতন, বিদেশে পেলেন মৃত্যু। এখনও এদেশে তাঁর নির্যাতনের অবসান হয়নি। যত রকমে তাঁকে ভুল বুঝতে ও বোঝাতে পারা যায় আমরা অশেষবিধ বুদ্ধি দিয়ে এখনও নতুন নতুন করে তার পথ খুঁজছি। আবার তাঁর অনুবর্তী বলে আমরা যারা নিজেদের পরিচয় দিতে চাই তাদের কথা আরও শোচনীয়।

তবু এই দেশে বিধাতার তরফ থেকে প্রাণের প্রথম প্রার্থনা এসেছে এই বাংলাদেশে। এই জন্য এই দেশকে আজ পর্যন্ত কম দুঃখ সইতে হয়নি। অবশ্য এই দেশেই এ পথের পথিকদের দুঃখ দেবার জন্যও বহু লোক জন্মেছে। তাদের মধ্যে কেউ বা গুপ্তচর হয়ে পায় সরকারি বেতন, কেউ বা প্রকাশ্যচর হয়ে পায় সংকীর্ণদৃষ্টি মোড়লদের তলব ও উৎসাহ। বাংলাদেশের দুঃখের অন্ত নেই। তবু যাঁরা সত্যকার বাংলাদেশের সাধকসন্তান তাঁরা কখনও এই দুঃখকে কোনো মতেই এড়াতে চাননি। এই সাধনায় চিরদিনই বাংলা সাড়া দিয়েছে। তার জন্য প্রাণ বিসর্জন করতেও সে ভয় পায়নি।

প্রাণের নামে মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। জীবন্ত ক্ষেত্রে জীবনের দাবিই চলে। কিন্তু তাই বলে এদেশের সাধনাকে পুরাকালের পাথরের জগদ্দল চাপে কঠিন ও ভারগ্রস্ত করে রাখলে তো চলবে না। মন্দিরের প্রাসাদের পাষাণভারে বাংলাদেশের উর্বর বিস্তারটিকে ঢেকে ফেলে জীবনের সেই দায়িত্বকে এড়াতে চাইলে আমরা হব ধর্মভ্রষ্ট।

নানা ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এসব কথার সত্যতা বোঝা যাবে। **মানবপন্থী বাংলাদেশ** প্রাচীনকালেও **ভারতের শাস্ত্রপন্থী** সমাজনেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্থযাত্রা ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই শাস্ত্রগত-সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি মত এই দেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন মগধও বাংলার সঙ্গেই ছিল একঘরে অর্থাৎ **স্বাধীন** হয়ে। **বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও দেখা যায় সেই স্বাধীনতা**। তাদের সাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারেনি। **শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই অথচ কি গভীর কি উদার তার ব্যঞ্জনা**। এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে না। **অপার মানবীয় ভাবের** কোথায় সীমা কোথায় শেষ? প্রাণের মতোই তা সর্বভারমুক্ত ও সহজ তার অতল অপারতার রহস্য।

[একই সূত্র, পৃ.৬-৭]

ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারেই শাস্ত্রনির্ভর পণ্ডিত। তাঁর কাছে শাস্ত্রই বড়, শাস্ত্রবহির্ভূত অন্যকিছু নয়। ধর্মসাধনার যে একটি রসের দিক রয়েছে এবং তা বাংলায়ই যে সবচেয়ে বেশি, সে-সম্পর্কে সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেন। তা ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন অবিচল হিন্দুত্ববাদী। রবীন্দ্রনাথের বাঙালির ধর্মসাধনার অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা তাঁর কতটা অনুমোদন পেয়েছিল তা জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন :

গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনাক্ষেত্রে। এ দেশ তাই নানাদিক দিয়েই মিলনের ক্ষেত্র। দিন ও রাত্রি মেলে সকাল ও সন্ধ্যায়। সেইরূপ সাধনার মিলনক্ষেত্রে যেমন ধ্যানযোগের সময়, বাংলাদেশের মিলনতীর্থে তেমনি রয়েছে বহু তপস্যার জন্য প্রতীক্ষা। কোনো লঘুতা চপলতা-চঞ্চলতা এখানে চলবে না। এখানকার উপযুক্ত সাধনা হলো ব্যাহৃতি-মন্ত্র 'ভুর্ভূবঃ স্বঃ'। অর্থাৎ স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষ-বিশ্বচরাচরে বিস্মৃত হোক আমাদের ধ্যান। কাজেই **এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই।**

বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতির ফল দেখা যাবে তার সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। সুরে ও বাণীতে অপূর্ব শিবশক্তির মিলন চিরদিনই বাংলা গানে যেমনটি দেখা যায়, তেমনটি ভারতে আর কোথাও ঘটেছে বলে শুনিনি। কীর্তনে বা বাউল গানে ভাবের মন্দিরে এখানে যে অপূর্ব পূজাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে তাতে নানা ফুল মিলিয়ে অপরূপ অর্ঘ্যরচনা করা হয়েছে। ভাবের রূপটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য বাংলাদেশের সাধকেরা প্রয়োজনমতো নানা সুর ও তালকে অপরূপভাবে সংগত করেছেন। তাতে প্রেমভক্তির যে প্রসাদ বাংলার রসমন্দির হতে পরিবেশন করা হয়েছে তার আর তুলনা নেই। কত ফুলের মধু আহরণ করে এখানকার উপাসকেরা এই অসাধ্য সাধন করেছেন।

[একই সূত্র, পৃ.৭-৮]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনায়ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। বাংলার ও বাংলার বাইরে ভারতের নানা উৎস থেকে, প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন মতবাদের ফুল থেকে মধু আহরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। একটিমাত্র ফুলের মধু অর্থাৎ এক ধর্মের শাস্ত্রীয় বাণী তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই বিচিত্র সূত্র থেকে অকৃপণভাবে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি সন্ধান করেছেন সত্যের। তিনি মনে করতেন, মানবপন্থী বাংলাদেশে সেটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

মরমি মানবতাবাদ

বহির্জগতের কোনো অস্বাভাবিক নির্মম ঘটনা অথবা ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক মানুষের, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদনশীল ও বড় ভাবুক প্রকৃতির মানুষের, অন্তর্জগতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে, তাঁর জীবনদর্শন পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। কুড়ি শতকের শুরুর কয়েকটি বছর ছিল তাঁর জীবনের তেমন একটি সময়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের জন্য তা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিস্থল। ওই রকম অবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে চিন্তাশীল মানুষ হয় খুব বেশি বস্তুবাদী হয়ে যান, অথবা মরমি অধ্যাত্মবাদী হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথও অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর প্রিয়জন ও ঘনিষ্ঠজনের অনেকগুলো মৃত্যুশোক পান, যা তাঁর মনোজগতে আনে নতুন পরিবর্তন।

১৮৯৯-১৯০০ সালে কলকাতায় মহামারির আকারে প্লেগ দেখা দেয়। অকালে প্রাণহানি ঘটে বহু মানুষের, যাদের মধ্যে ছিলেন তাঁর পরিচিতজনও। বিবেকানন্দ-ভক্ত ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১) সঙ্গে তিনিও ত্রাণকাজে অংশ নেন। দেখেছেন প্রতিদিন মানুষের অসংখ্য মৃতদেহ যাচ্ছে হয় শ্মশানে অথবা গোরস্থানে। মৃত্যুরূপ মহামারির কাছে মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের কোনো মূল্য ছিল না। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় প্রার্থনা হয়েছে, কিন্তু বিধাতার কানে সে আর্তনাদ পৌঁছায়নি। অকাতরে প্লেগে প্রাণ দিয়েছে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে কলকাতার মানুষ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র ও তাঁর একজন আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) অসামান্য গদ্যলেখকও ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্রসমালোচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও তিনি ছিলেন

অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং একজন সহযোগী। প্রতিভাবান বলেন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রভাত মুখোপাধ্যায় জানান, 'বলেন্দ্রনাথের সকল কার্যেই রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল, কিন্তু এই 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাই না। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় হইতে শিলাইদহে নিজ সন্তানদের জন্য 'গৃহবিদ্যালয় স্থাপনে পরিকল্পনারত।' বলেন্দ্রনাথ মহর্ষির 'আধ্যাত্মিক সম্পদকে আরো ঐশ্বর্যশালী করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল একেশ্বরবাদীদের মধ্যে একটি যোগ সংস্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনি পাঞ্জাবের আর্যসমাজীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খ্রিষ্টধর্ম, ইসলাম প্রভৃতির ধর্মনেতাদের সঙ্গেও কথা বলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ও স্থাপিত হলো, এমন সময় আকস্মিকভাবে ২০ আগস্ট ১৮৯৯ বলেন্দ্রনাথ মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড আঘাত পান। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের আরব্ধ কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকেনি। দুই বছরের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যালয়কে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পরিণত করেন। তিনিই হলেন তার আচার্য অর্থাৎ শিক্ষা ও ধর্মগুরু।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক ভুলতে না ভুলতেই ১৯০২ সালে মৃণালিনী দেবী মারা যান। এ মৃত্যুও অপ্রত্যাশিত এবং তাঁর জীবনে সৃষ্টি করে গভীর শূন্যতা। স্ত্রীর মৃত্যুর পরের বছর কন্যা রেণুকার মৃত্যু। ১৯০৪ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ 'শ্রদ্ধা ও স্নেহের চোখে' দেখতেন, গভীর ভালোবাসতেন এবং 'কতদিন সূর্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত' হয়ে এসেছে। সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক মাস পর দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমন। তাঁর মৃত্যু পরিণত বয়সে, সুতরাং অপ্রত্যাশিত নয়। যদিও তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক পিতাপুত্রের চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল। ১৯০৭ সালে শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের জীবনে আরেক প্রচণ্ড আঘাত। পর পর এতগুলো মৃত্যু তাঁর অন্তর্জগতে পরিবর্তন আনে। জীবন ও জগৎকে নতুন করে উপলব্ধি করেন, সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্ক নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাববার অবকাশ পান।

এরমধ্যে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও উত্তাল হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম কয়েক মাস সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু রাজনীতি সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষের আকার ধারণ করায় তিনি নিজেকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেন এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারে

মনোযোগী হন। এই সময়টিতে, ১৯১০ অব্দে, শান্তিনিকেতন থেকে দুটি বই প্রকাশিত হয়: *গীতাঞ্জলি* ও ক্ষিতিমোহন সেনের *কবীর*। অনেকের মতে, *গীতাঞ্জলি* ও *কবীর* 'ভাবসাযুজ্যের কারণে' বস্তুত 'একই সূত্রে গ্রথিত'। *গীতাঞ্জলি* ও *নৈবেদ্য* রচনার সময় *কবীর*-এর আধ্যাত্মিক বাণী রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে *কবীর*-এর ভক্তিগীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি *গীতাঞ্জলির* ভক্তিগীতি রচনায় উদ্বুদ্ধ হন, তা সঠিক নয়। ক্ষিতিমোহন মাসিক *বসুমতি*কে (বৈশাখ ১৩৫৩) বলেছিলেন, *গীতাঞ্জলি* ও *কবীর*-এর বাণীর মধ্যে 'ভারসাম্য' থাকলেও 'কবীরের বাণী দেখিয়া তিনি গীতাঞ্জলি লেখেন নাই। গীতাঞ্জলি দেখিয়া তাঁহাকে আমি কবীরের বাণী দেখাই।' ক্ষিতিমোহনের মতো উঁচু নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সাফাই গাইবেন না। *কবীর*-এর বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আগে থাকলেও তাঁর দোঁহাগুলোর সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় ক্ষিতিমোহন অনূদিত *কবীর* পাঠ করেই। রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* ও *নৈবেদ্যর* ভক্তিগীতি তাঁর নিজের অন্তর থেকে উৎসারিত বাণী। তবে ক্ষিতিমোহনের অনুবাদ পাঠ করে তিনি এতটাই উদ্বুদ্ধ হন যে, ১৯১৪ সালে তিনি নিজেই *কবীর*-এর ১০০টি বাণীর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদে অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং এডলিন আন্ডলহিল-এর সহায়তা ছিল। রবীন্দ্রনাথ *কবীর*-এর বাণীর মানবতাবাদী দার্শনিক তাৎপর্যে প্রভাবিত ও আরও পরিপুষ্ট হন, তাতে সন্দেহ নেই।

কবীর দিল্লির সুলতান সিকান্দার শাহ লোদির (১৪৮৯-১৫১৯) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তাঁর *আইন-ই-আকবরি*তে আবুল ফজল জানিয়েছেন, কবীর প্রচলিত আচারসর্বস্ব ধর্মীয় পথের বিরোধিতা করে নিজের উপলব্ধ সত্যকে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেন।

কবীরের দর্শন সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন:

> কবীর দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম সকল সীমাকে পূর্ণ করিয়াই সকল সীমার অতীত। তাঁহার ব্রহ্ম কাল্পনিক (Abstract) ব্রহ্ম নহেন, তিনি একেবারে সত্য (Real); সমস্ত জগৎ তাঁহার রূপ। সব বৈচিত্র্য সেই অরূপেরই লীলা। কল্পনার দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে হইবে না; ব্রহ্ম সর্বত্র সমাহিত, সেই সহজের মধ্যে নিমজ্জিত হইতে হইবে। কোথাও যাওয়া আসার প্রয়োজন নাই, ঠিক যেমনটি আছে তেমনটিতে প্রবেশ করাই সাধনা।

কবীর লেখাপড়া জানিতেন না। অসাধারণ প্রতিভা ও সাধনার বলে সর্ববিধ জ্ঞানেই তাঁহার অব্যাহত প্রবেশ ছিল।

[ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, ভূমিকা, আনন্দ সংস্করণ, জুন ১৯৯৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শনের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা 'historical setting' অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন পশ্চিমের কেউ কেউ, যাঁদের একজন অধ্যাপক উডস (Woods)। ম্যাকমিলান থেকে যখন রবীন্দ্রনাথের *কবীর*-এর অনুবাদ বের হয় তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেই সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন, কারা কারা তাঁকে প্রভাবিত করেছেন, বিশেষ করে কবীর সম্পর্কে—Who have influenced you, especially something about Kabir. প্রশান্ত পালের জীবনীতে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

কবীর তাঁর দোঁহায় এমন কিছু নতুন কথা বলেছেন, যা তাঁর আগে আর কেউ হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানসংখ্যালঘু ভারতবর্ষে অত সরাসরি বলেননি। তাঁর বাণী সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী এবং মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির সেতু রচনায় খুব বড় ভূমিকা রেখেছিল। কবীরের বাণী এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাধকের ভক্তিগীতি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে তা বলা যাবে না—প্রাণিত করে।

ক্ষিতিমোহন যেভাবে সন্তধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, সন্ত-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দাদু-কবীর-রজ্জব প্রমুখের বাণী প্রভৃতি এবং সুফি ও বাউলদের সাধনার তত্ত্ব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে লেগে ছিলেন, সৃষ্টিশীল প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের সে অবসর ছিল না। তবে অধ্যাত্মপিপাসা নিবারণে বাউল জীবনতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথও পর্যালোচনা করতেন। সমাজের তলায় পড়ে থাকা অবহেলিত মানুষের সাধনার মধ্যেও যে সত্য রয়েছে তা খুঁজে বের করে শিক্ষিতদের অবগত করেছেন। তাঁদের কথা তিনি পশ্চিমে গিয়ে পর্যন্ত সেখানকার ভাবুকদের কাছে বলেছেন। মধ্যযুগের নিরক্ষর সাধুসন্ত এবং একালের গ্রামীণ আউলবাউলদের সাধনায় গভীরতা যে প্রাচীনকালের মুনিঋষিদের চেয়ে বিশেষ কম ছিল না—তা তিনি বলতে দ্বিধা করেননি। তাঁরাও ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সন্তধর্ম ও বাউলতত্ত্বচর্চায় উপকৃত হয়েছিলেন। লোকধর্ম, সন্ত-সাধনা ও বাউল ধর্মের চর্চা ও বাউল গানের দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি তাঁর নিজের মানবধর্ম তথা প্রেমধর্ম—religion of love—গড়ে তোলেন।

কবীর মুসলমান ছিলেন কি না সে তথ্য এখন আর কোনো তাৎপর্য বহন করে না। মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেও শাস্ত্রীয় ইসলামের বিধিবিধানে তাঁর

সায় ছিল না। কোনো প্রাণহীন ধর্মীয় আচারেই তাঁর আস্থা ছিল না। অক্ষরজ্ঞানহীন কবীর দক্ষিণের ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কারক রামানুজের চিন্তাধারা উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন। গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান ধর্মমতের বিরুদ্ধে তা ছিল এক ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। বিশেষ করে, বেদান্ত দর্শনের অতিরিক্ত বুদ্ধিবাদী সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ওই কাজটি চার শো বছর পরের মানুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছেন।

গীতাঞ্জলির গানগুলোর রচনা এবং কবীরের দোঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় একই সময়। নিঃসন্দেহে তিনি কবীর দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছেন, ক্ষিতিমোহন তা অস্বীকার না করেও বলেছেন, 'যাঁরাই বাস্তবিক সাধক তাঁদের প্রত্যেকেরই একের অপরের সঙ্গে এক না এক প্রকারে যোগ চিরদিন আছে, অথচ কেউ কারো কাছে ঋণী নন।' পূর্বপুরুষের কাছে উত্তরপুরুষের ঋণ দোষের কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের অদ্বৈত ঈশ্বরসাধনায় কবীরের দোঁহা ও তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদর্শন সহায়ক ভূমিকা পালন করায় লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয়নি।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী কয়েকটি বছর রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বড় বড় একেশ্বরবাদী ধর্ম ও লোকায়ত ধর্মমত থেকে তিনি পরমাত্মা ও সত্যের সন্ধান করছিলেন। জীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের বক্তব্য থেকে সে সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায় :

> বিভিন্ন ধর্মের, বিশেষত লোকায়ত ধর্মগুলির, অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধান ও চর্চা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্ব থেকে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে অজিতকুমার 'ভক্তবাণী' সংকলন করেছিলেন, ক্ষিতিমোহন কবীর দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সন্তদের দোঁহাবলি অনুবাদ করছিলেন, ১৯০৮-এ বার্লিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় প্রদত্ত বক্তৃতাবলি থেকে সার-সংকলন করছিলেন মীরা [অতসী] দেবী ও হেমলতা দেবী। তিনি তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদনার ভার নেওয়ার পর প্রিয়ম্বদা দেবী ভক্তবাণী-র অনুসরণে 'সাধ্যবাক্য' [বৈশাখ, শ্রাবণ] সংকলন করেছেন, দিনেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সুফী ধর্ম্ম' [বৈশাখ], 'সুফী ধর্ম্মমত' [জ্যৈষ্ঠ], 'সুফি কবি' [আষাঢ়], 'বাবীধর্ম্ম [শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক], জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'বাহাই ধর্ম্ম' [অগ্রহায়ণ পৌষ], ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন 'মহনুবীধর্ম্ম' [পৌষ] জাতীয় প্রবন্ধগুলি। অনুমান করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমেই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল ও এদের অনেকগুলিই তাঁর দ্বারা সংশোধিত। সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোঁড়ামিতে বন্ধ না থেকে বিবিধ ধর্মের সারসত্যটুকু তিনি সমন্বিত করে নিতে

চাইছিলেন, এগুলি তারই প্রমাণ। তাঁর নিজস্ব রচনায় এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

[প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড, পৃ.২৩০]

মধ্যযুগে ভারতে বহু ধর্মনিরপেক্ষ তত্ত্বদর্শীর আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে সন্ত কবীর শীর্ষে, যাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অপার। তাঁর বাণীর প্রতি তাঁর সমর্থন অকুণ্ঠ। কবীর ও তাঁর গোত্রের অন্য শাস্ত্রবহির্ভূত সাধক ও তত্ত্বদর্শীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তমান, তাহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত, মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার।

বাউল ফকির লালনের গানও তাই। ভাবের আগুনই প্রধান, গানটা উপলক্ষ মাত্র। যদি তাঁর গদ্যভাষায় লেখার ক্ষমতা থাকত, তাহলে তাতেই তাঁর জীবন-দর্শন লিখে যেতেন। তাঁর গানের বাণীই তাঁর দর্শনতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা শুধু নিজের আত্মার শান্তির জন্য নয়, বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণও তাঁর লক্ষ্য। তাঁর দর্শন মানুষের মুক্তির দর্শন। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের আত্মিক মুক্তির জন্য এবং সামাজিকভাবে মানুষের কল্যাণের জন্য যে শিক্ষা ও সাধনা, সেটাই তাঁর ধর্ম ও দর্শন। তাঁর ধর্ম অনুশীলনের জন্য কোনো রকম পূজা-পার্বণ ও যাগযজ্ঞ বা আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় না। সেটা সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও বিশ্বাসের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোমাত্রায় একজন সংসারী মানুষ ও বাস্তববাদী, তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন গভীর আধ্যাত্মিক সাধক, যাঁর লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি।

হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম'

১

আনুষ্ঠানিক পাঠ না নিলেও এবং তাঁর চর্চার প্রধান ক্ষেত্র না হলেও—বিষয় হিসেবে ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে অনধিগত ছিল না। ভারতীয় ষড়্‌দর্শন রবীন্দ্রনাথের অপঠিত ছিল, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র এবং দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বকনিষ্ঠ সহোদর হিসেবে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে তাঁর ভালোভাবে পরিচয় হয় বাল্যকালেই। উনিশ শতকের বাংলার খ্যাত-অখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিতদের—যাঁরা ন্যায়-নব্যন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন—তাঁদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাঁদের সংস্পর্শে এসেছেন।

সেকালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে একটি ধর্মবিষয়ক সম্মেলনও হতো, যার নাম ছিল 'একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন'। ১৯১১ সালের ২৬-২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় ২৬তম একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পণ্ডিত বিষাণ নারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে। একই সময় ১৯তম সর্বভারতীয় একেশ্বরবাদীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা সিটি কলেজ ভবনে। তাতে সভাপতিত্ব করেন ম্যাঙ্গালোরের উল্লল রঘুনাথাইয়া। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন 'ধর্মশিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনা করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, সেকালে তাঁর দর্শনবিদ হিসেবে নামডাক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত বলেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিদ্যালয়ের ধর্মশিক্ষার বিষয়ে। তিনি বলেছিলেন :

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লেখকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্বৃত্তটুকু দিয়া কাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করি।

প্রধানত ব্রাহ্মধর্মের মহিমাই তিনি প্রচার করেছিলেন ওই প্রবন্ধে। তবে তা সাম্প্রদায়িক ধর্মনেতার ভাষায় নয়, ধর্মদার্শনিকের ভাষায় :

...যিনি যাহাই বলুন **ব্রাহ্মধর্ম** কোনো একটি বিশেষ **নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা** নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী—তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সে-সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দলমতও এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে তাহাকে বধ করিতে হইবে।

আচারসর্বস্ব ও শাস্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। নিঃস্বার্থ মঙ্গলকর্মই তাঁর ধর্মসাধনা। ধর্মকর্মের জন্যে দেবমন্দিরে যাতায়াত অপরিহার্য নয়। তাঁর ভাষায় :

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্রে মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং **স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান**। এমন-কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেন না পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হওয়ার মধ্যে স্বভাবেই গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

[ধর্মশিক্ষা]

সংহত ও সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ জাতিগঠনের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথ 'একটি ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ গড়ে' তোলার বাসনা মনে পোষণ করতেন। তবে তিনি জানতেন, সে কাজটি তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়। সে দায়িত্ব তিনি নিতেও চাননি। কেউ কখনো নিলে তিনি খুশি হতেন।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোঁড়া হিন্দুদের শুধু নয়, ব্রাহ্মনেতাদের সঙ্গেও মতপার্থক্য লেগেই ছিল সব সময়। প্রথম জীবনে তিনি প্রতিবাদ করতেন, পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম নেতারা যিনি যা-ই বলুন, তিনি তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে নীরবতা অবলম্বন করতেন। বিতর্কের 'ধূলি উড়ানো' তিনি পছন্দ করতেন না। প্রথম দিকে প্রতিপক্ষের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শিক্ষার্থীদের এক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্বকৌমুদী*তে তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ করা হয়। *তত্ত্বকৌমুদী* পত্রিকার সম্পাদকের 'আদি সমাজ ও উন্নতশীল ব্রাহ্মসমাজ' [১ বৈশাখ ১৩১৯] শীর্ষক ওই নিবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু ব্রাহ্ম' শীর্ষক একটি আত্মপক্ষসমর্থনমূলক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে তাঁর আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস ও ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে 'নেতা হিসাবে নন' তিনি নিজস্ব অভিমত ব্যাখ্যা করেন। 'আত্মপরিচয়'-এও তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন: 'হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু।' এই কথাটির অতি সত্যতা পরে প্রমাণিত হয়েছে। ব্রাহ্মরা হিন্দুই থেকে যান।

রবীন্দ্রনাথের অনেক উদার ও স্পষ্ট বক্তব্য রক্ষণশীল হিন্দু নেতাদের দ্বারা অযৌক্তিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি জন্মগতভাবে ধর্মমতে ব্রাহ্ম হলেও নিজেকে কখনোই হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের বাইরের একজন ভাবেননি। ব্রাহ্ম ধর্মমত সম্পর্কে গোঁড়া হিন্দুদের অকারণ বিরূপতা ছিল। ব্রাহ্মধর্মমতের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত এ রকম:

> ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু ইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যত বড়ই সর্বজনীন ধর্ম হোক না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্মের এই

ঐতিহাসিক বন্ধুনটুকু স্বীকার করিতে লজ্জা বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দু ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার সুস্পষ্ট অর্থই এই যে, হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এই ধর্ম এই প্রকার রূপ লইয়া এইখানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয়তো বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরাণ পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশ দেশান্তরের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির ন্যায় এই ব্রাহ্মধর্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দু ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্যের আলোক সূর্যেই সম্ভবপর হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন সূর্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে। তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্যেরই। আমি শাক খাইয়া ফল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাক ভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঔদার্য প্রকাশ করা হয়? প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন খ্রীস্টধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টানধর্ম হইতে চুরি, এমনতরো আরো অনেক বাদবিবাদ আছে—তেমনি হয়তো কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন *ব্রাহ্মধর্ম জগতের সকল ধর্মের চোরাইমালের ভাণ্ডার।* কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদ সত্ত্বেও খ্রীস্টানধর্ম খ্রীস্টানধর্মই, বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণবধর্মই। খ্রীস্টানধর্ম যদি বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম যদি খ্রীস্টানধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মীয়ে পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি—অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যত কিছু কারণপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা আমার প্রিয় হইলেও সত্য, অপ্রিয় হইলেও সত্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বকৌমুদী

সম্পাদক মহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মধর্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।' ['ব্রাহ্মধর্মের মূল-মত ও অবান্তর বিষয়', তত্ত্বকৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯] আমি তো সর্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। *হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম*, কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে' এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল য়িহুদি মুসলমান য়ূরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন? ['হিন্দু কি?' *তত্ত্ব কৌমুদী*, ১৬ চৈত্র ১৩১৮]

পরিচয় নানা প্রকারের আছে—কোনোটা সংকীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাহার দেনাপাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল; তাহাতে তাহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই। আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, য়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসংকোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই—চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। ...

বেদান্তদর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্মন পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা য়িহুদির লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না? প্লেটোর রচনা কি গ্রীসের সীমার বাহিরে অস্পৃশ্য? আরিস্টটলের দর্শন কি মুসলমান জ্ঞানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার শক্তি দ্বারাই কি তাহার গৌরবহানি হইয়াছিল? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিত্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা জগৎসংসারে তাহা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

[*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯]

ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই লেখা তেমন আলোচিত-পঠিত নয়। এতে যেসব যুক্তি তিনি প্রদর্শন করেছেন তা অকাট্য। হিন্দুসমাজ থেকেই দীক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন অনেকে এবং সেটা হয়েছিলেন খুব সহজে। তাদের জন্মগত হিন্দুধর্মের বিশেষ কিছু বিসর্জন দিতে হয়নি। যেমন একজন মুসলমান বা হিন্দু খ্রিষ্টান হলে তাকে তার আগের ধর্মের প্রায় সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে রীতিমতো ধর্মান্তরিত হতে হয়। হিন্দু বা খ্রিষ্টান কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও একই অবস্থা। হিন্দু ও ব্রাহ্মের মধ্যে ব্যবধান ছিল অতি সামান্য। হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষ যেমন খ্রিষ্টান বা মুসলমান বা ইহুদি কেউ ব্রাহ্ম হতেন না। তবে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার সময় তাঁদের অনেকে উপস্থিত থাকতেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) রবীন্দ্রনাথের একজন স্নেহভাজন হিসেবে তাঁকে যেমন খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি তিনি রবীন্দ্রসাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পড়ারও অবকাশ পান। গোটা কর্মজীবনই তাঁর কাটে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শনের সর্বজনীন আবেদনের কথা বলতে গিয়ে প্রবোধচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ এমন এক ধর্ম, এমন এক জীবনদর্শনের অনুসারী 'যাতে জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম মিলিত হয়েছে, যাতে উপনিষদের সত্যসাধনা, বৌদ্ধধর্মের মৈত্রীকরুণা ও খ্রিস্টধর্মের প্রেমভক্তি একত্রে সমন্বিত হয়েছে, অথচ যা সর্বতোভাবেই আধুনিক শিক্ষিত মনের উপযোগী। সে মন একান্তভাবেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ আচার-পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার বিরোধী।' এ বক্তব্য সঠিক। তবে এইসঙ্গে তিনি ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর কথাও উল্লেখ করতে পারতেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিজস্ব ধর্মের' পার্থক্য যথেষ্টই। তিনি তাঁর 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন :

> সকল মানুষেরই 'আমার ধর্ম' বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে—কোন ধর্মটি তার? যে ধর্ম মনের ভেতরে গোপন থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে।

বৈদিক ধর্মের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধাশীল হয়েও কাদম্বরী দেবীকে (১৮৭৮-১৯৪৩) লেখা এক পত্রে তিনি হিন্দু গোঁড়ামির বিরোধিতা করেছেন। তা তিনি বহুবার বহুভাবেই করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদেরও তিনি অনড় সমর্থক ছিলেন না, কোনো একটিমাত্র ধর্মগ্রন্থ তাঁর 'ধর্মগ্রন্থ' ছিল না। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এই কথাতে :

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে দর্শন সম্পর্কে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা তোমাদের জানাতে। এ বিষয়ে কিছু বলতে আমি সর্বদাই কিছুটা দ্বিধা বোধ করি। আর একটা কারণ হ'ল কেবলমাত্র কোনো একটি বংশে জন্ম সূত্রে যারা কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়, আমি তাদের বিভাগে পড়ি না। আমি এমন এক পরিবারে জন্মেছি যে পরিবার উপনিষদে প্রাচীন ভারতের সাধু-সন্তদের পথ নির্দিষ্ট এই দেশের এক মহান ধর্মের পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু আমার খেয়ালী আচরণের জন্য চারপাশের মানুষ যা সত্য মনে করেন কেবলমাত্র সেই ভিত্তিতে কোনো একটি ধর্ম আমার পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। আর তাই আমার চিত্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে এমন এক পরিবেশে গড়ে উঠেছে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা শাস্ত্রসম্মত পথে আমাকে চলতে হয়নি।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষণ এবং বক্তৃতা, ম্যাকমিলন অ্যান্ড কোম্পানি, লন্ডন, *ভারত প্রসঙ্গ*, নয়াদিল্লি, ২০১০]

বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, মৈত্রী ও করুণা, ইসলামের মানুষে মানুষে সাম্য এবং সুফিবাদী ইসলামি ধারার প্রেমধর্মও তাঁকে প্রবলভাবেই প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম যে প্রথাগত হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম নয়, তা তাঁর নিজস্ব ধর্ম, তাঁর নিজেরই উদ্ভাবিত ধর্ম, তা তাঁর জীবনীলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :

ধর্মজ্ঞান ভাষাজ্ঞানের ন্যায় মানুষ শিশুকাল হইতে কখন ও কিভাবে যে আয়ত্ত করে, তাহার ইতিহাস বলা কঠিন; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সংগীত স্তব্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঈশ্বরবিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যে ভাবে কল্পনা করিতেন, তাহা যে কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক তাহা নহে তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ। তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।

[*রবীন্দ্রজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৪২]

কোনো রকম সংকীর্ণতা ও অযৌক্তিকতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্রয় দেননি। নিজের ধর্মের নামে ভক্তিতে গদগদ হওয়াও তাঁর স্বভাব নয়। তাঁর ধর্মবিশ্বাসই যে শেষ তত্ত্ব তা তিনি মনে করতেন না :

সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেইজন্যই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে

একজন বিশেষ নামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, ছেলেবেলা হইতে আজ পর্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি ও সে ভুল ছাড়িয়াছি, কত মত লইয়াছি ও বিসর্জন দিয়াছি, শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটি করা আমার রাশি রাশি এক্সেরসাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অদ্যকার শিক্ষার একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি তো দেখিব, মতে ভাবে কর্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে; সেই সূত্রটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দেশ করা কঠিন; অনৈক্যের পরম্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান—তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে—সে প্রতিদিনের ভুরি ভুরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনি হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্মের আচারের পরিবর্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না এবং না থাকাই মঙ্গল। সেইরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাহারা গৌরব বোধ করেন তাহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক—সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীরভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্যের সঙ্গে অনার্যকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে, সেই শক্তি শক হুন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শক্তি শত শত ধর্মমত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি সুমহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার এই বাধাই তাহার নিত্য নহে; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে তাহা সংকীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘ পথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মতো কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে? এতদিনের দায় বহনটা রহিল হিন্দুর, আর সেই দায় শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র খাতায় জমা করিয়া

লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা? যেখানেই হিন্দু ইতিহাসের সফলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সকল হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চৌকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এসো খ্রীস্টান, এসো মুসলমান, এসো য়িহুদি, আমরা ব্রহ্মনামের সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাব্রতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে, ইহা কেবল আমাদেরই এই কয়জনের। ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তনকালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশকালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই—এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়ার—কবন্ধের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বস্ত আছে; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্বতা ঘটে।'

[*তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পৃ, ৭২৭-৭৩০]

তবে প্রথাগত ব্রাহ্মধর্ম থেকে তিনি নিজেকে কখনো ঘোষণা দিয়ে বিযুক্ত করেননি। তার কোনো আবশ্যকতাও বোধ করেননি। নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাসে অবিচল থেকেও নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তিনি একাত্ম থেকেছেন সব সময়। সংঘবদ্ধ ধর্মচর্চাকেও তিনি মূল্যহীন মনে করেননি। প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

> ...কবির চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, প্রায় প্রতি বৎসরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে নানা উৎসবের সময়ে 'ব্রহ্মসংগীত' লিখিয়াছিলেন। অন্যের অনুভূতিকে নিজ অনুভূতির মধ্যে জাগাইয়া ভাষাদান করা হইতেছে দরদি-কবির কাজ—আর নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা হইতেছে সাধক-কবির কাজ। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে ভাষা ও সুর দান করিয়া তিনি ব্রহ্মসংগীত লেখেন। উহাদিগকে আমরা 'রচিত' গান বলিব, ভক্তহৃদয়ের বেদনাসজ্ঞাত ভাবসংগীত বলিতে পারিব না।
>
> [*রবীন্দ্রজীবনী*]

ধর্ম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব শুধু তাঁর কবিতা বা গদ্য রচনায় নয়, গল্প-উপন্যাসেও প্রকাশ পেয়েছে। যেমন *গোরা* উপন্যাসে আছে, তেমনি তাঁর 'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তীর বাবার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তাও রয়েছে, কারণ তিনি 'ব্রাহ্মণ নন, খৃস্টানও নন,

হয়তোবা নাস্তিকও না হইবেন। দেবার্চনার কথা কোনোদিন তিনি চিন্তাও করেন নাই।...মেয়েকে দেবতা সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেন নাই।' বিশেষ করে, 'উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী' যাঁরা তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একধরনের সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল। তবে 'উগ্রভাবে সমাজবিদ্রোহী' এবং 'উগ্রভাবে সমাজের অনুসারী' 'কোনোটাই সরল স্বাভাবিক নহে' বলেও রায় দিয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত 'লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে' বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ কোনো দেবতার পূজা করতেন না, তবে ব্রহ্মের উপাসনা করতেন। সে উপাসনা একাগ্র চিত্তেই করতেন। রামমোহনের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল—'যেখানে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই স্থানে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক।'

[*রামমোহন-গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, পৃ.১২৫]

সে জন্য কোলাহল থেকে দূরে উপাসনার জন্য নির্জন স্থান ছিল তাঁর প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে হিন্দুদর্শনে অসামান্য পণ্ডিত ভারততত্ত্ববিদ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী এবং তাঁরা ছিলেন বন্ধুস্থানীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) সহপাঠী। উপমহাদেশে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনে তাত্ত্বিক ভূমিকা যাঁরা পালন করেন বিবেকানন্দ ও ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে প্রধান। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং তাঁদের ব্যক্তিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল। 'তদুপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবও ব্রজেন্দ্রনাথে বর্তমান', লিখেছেন শীলের একজন গবেষক।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক তাঁদের প্রথম যৌবনকাল থেকে। তাঁরা পরস্পরের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় দর্শন ও পশ্চিমি দর্শন শুধু নয়, বাঙালির দার্শনিক ভাবনা নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, একবার দুবার নয়—বহু বার।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ একই মতাদর্শী ছিলেন না। শীল ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও হিন্দুত্ববাদী, রবীন্দ্রনাথ প্রগতিশীল ও আধুনিক। কিন্তু বিপরীত মতাবলম্বীর সঙ্গে কথা বলতে রবীন্দ্রনাথ সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন। তার থেকে যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা করতে তাঁর আগ্রহ ছিল—তাঁর হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী মতাদর্শে নয়।

জাপান ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফেরার কিছুদিন পর ১৯১৭ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রবীন্দ্রনাথকে রামমোহন লাইব্রেরিতে এক সংবর্ধনা দেয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি 'পশ্চিমে ও পূর্বে

রবীন্দ্রনাথের আদান-প্রদান' শীর্ষক রবীন্দ্রসাহিত্যের এক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর সেই বক্তৃতায় বন্ধুকে প্রশংসার পরিমাণ ছিল বেশি, বিচার-বিশ্লেষণ নয়। ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তাঁর বাণী যে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি, সে কথাটি তিনি গোপন করে যান।

হিন্দুত্ববাদী ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুসভ্যতার ইতিবাচক দিকটির ওপরই গুরুত্ব দিতেন, সেটা সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথও দিতেন, তবে উভয়েই পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। আদান-প্রদান দুদিক থেকেই হতে হয়, একতরফা হয় না। পশ্চিমিরা প্রাচ্য থেকে সম্পদ লুণ্ঠন করা ছাড়া, এ দিকের ভাবসম্পদ গ্রহণের বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। যা হোক, পূর্ব পশ্চিমের আদান-প্রদানের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ একজন দূতের ভূমিকা পালন করছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সেই দিকটির প্রতি জোর দিয়ে বলেছিলেন :

> পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের এই আদান-প্রদানের দ্বারা কি সাব্যস্ত হইতেছে? ইহাই সাব্যস্ত হইতেছে যে, পশ্চিমের সামাজিক আদর্শের ভিতর যাহা উদার ও উন্নত তাহার সহিত পূর্বদেশীয় হিন্দুর সামাজিক আদর্শের reconciliation বা সৌসামঞ্জস্যের স্থান আছে। Rituals (পদ্ধতি), symbols (প্রতীক), ceremonials (অনুষ্ঠান), myths (পুরাণ) প্রভৃতি ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে বরাবর একটা বিশাল মুক্তির ভাব আছে—হিন্দু সভ্যতার তাহা এক আশ্চর্য বিশেষত্ব। সেই মুক্তিতত্ত্বে ও মুক্তিসাধনায় সাম্য-বৈষম্য, সসীম-অসীম, ভোগ ও ত্যাগের এক মহাসম্মিলন, এক মহাশ্চর্য সমাধান দেখিতে পাই। হিন্দুধর্ম কেবলই কর্মকাণ্ড নহে, কেবলই rituals (পদ্ধতি), symbols (প্রতীক) প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন ও ভারাক্রান্ত নহে। এই ভারতবর্ষে নানাজাতির ও ধর্মমতের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া এই এক বিশাল মুক্তির আদর্শ হিন্দুধর্মের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই আদর্শ বিশ্বজগৎকে দান করা সম্বন্ধে হিন্দুর গুরুতর দায়িত্ব আছে। যুগে যুগে হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে এই আদর্শ নানাভাবে প্রচারিত হইয়াছে, এবং রাজা রামমোহন রায় তাহারই বার্তা বহন করিয়া এই যুগে আসিয়াছিলেন। Symbols, rituals প্রভৃতির বন্ধন হইতে সেই বিশাল মুক্তির তত্ত্বকে মুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে প্রদান করিতেছেন এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ মুক্তির আদর্শের সহিত তাহার সৌসামঞ্জস্য দেখাইতেছেন।
>
> [*প্রবাসী*, ভাদ্র ১৩২৪]

বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের পত্রালাপে তাঁদের ভেতরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্পর্কে জানা যায়। ১ মার্চ ১৯১৮ কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথের পত্র, মহীসুর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা

শীলের চিঠি (২৪ নভেম্বর ১৯২১, ১২ ডিসেম্বর ১৯২১) প্রভৃতি থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করা যায়। ১৪ কার্তিক ১৩২৮ এক চিঠিতে শীলকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সভায় আপনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইয়াছি। বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি। কোনোকালেই বিদ্যাকে খণ্ডিত করিয়া দেখা উচিত নহে—বর্তমানকালে তাহা আরো অনুচিত। কারণ বর্তমানে সকল জাতির মানুষ পরস্পরের গোচরে আসিয়াছে—এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্কার দ্বারা আবৃত্ত করা, বিধাতার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা। মহীসূরের ছাত্রদের মনকে সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ হইতে আপনি রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন ইহা আপনারই যোগ্য কাজ হইয়াছে, আমিও এইরূপ কাজেরই ভার লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু বড়ই বাধা। **নিজেকে বড় একলা বোধ হয়।**
>
> *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬৫, পৃ.২৬৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য শীলকে আমন্ত্রণ জানান তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে। শীল তা গ্রহণ করেন। সে উপলক্ষে কবি 'বিশ্বভারতী পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা' উৎসবে ভাষণ দেন। ভাষণটি পরে সংক্ষেপিত আকারে *বিশ্বভারতী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুরুতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের কি কর্তব্য, এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়' তা আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই।

তাঁর নিরীক্ষাধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ অন্যরকম ধর্মশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, ধর্মবিশ্বাসগুলোর পরস্পর-বিরোধিতা নিয়ে মানুষ হানাহানি করে। কারও প্রতি হিংসা কোনো ধর্মেরই সত্যরূপ নয়, এই বোধ অল্প বয়স থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যে জন্মানো দরকার। সে জন্য তিনি ধর্মতত্ত্ব পড়ার ওপর জোর না দিয়ে বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিয়ে ছেলেমেয়েদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবে আশ্রমের গুরুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'কেবল হিন্দুত্ব স্বীকার করিলে চলিবে না', বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

তাঁর ধর্মসংক্রান্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে মনে হয়, ইসলাম ধর্মের সারসত্তা রবীন্দ্রনাথ যতটা উপলব্ধি করেছিলেন বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমানও তা করতে পারেন কি না সন্দেহ। তাঁরা আচার, আনুষ্ঠানিকতা ও উপকথাকে প্রাধান্য দেন।

বৌদ্ধধর্মের জন্ম ভারতবর্ষেই, হাজার হাজার বছর হিন্দু-বৌদ্ধ এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তারপর আসে ইসলাম। বিপুলসংখ্যক হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করে। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাদের ৯৮ শতাংশই এই দেশের সন্তান। ভারতবর্ষের মুসলমানদের জীবনাচরণে স্থানীয় হিন্দুসংস্কৃতির বহু উপাদান গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে, বাংলার ইসলাম এক ভিন্ন ধরনের সমন্বয়ী ইসলাম—যা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম থেকে আলাদা। হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধানের দেয়ালটি অতি উঁচু দেখতে পাননি রবীন্দ্রনাথ। পরস্পরের সংহতি যত শক্ত হবে, তত সমাজ ও দেশের কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম জীবনসাধনা ভারতবর্ষকে এক উন্নত, সুসংহত, অহিংস জীবনের ধারণা দিতে পারে, অন্য কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক পথে তা সম্ভব নয়। এবং সেই ধর্মীয় ও সামাজিক সমন্বয় বা হারমোনির ধারণা পৃথিবীকে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি বলতেন, অন্য সব দেশ ও জাতির মধ্যে যা ভালো তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে অকুণ্ঠভাবে।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মনকে 'পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত' করা। বাংলার মানুষ 'আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত'ভাবে উন্নত তবে ইউরোপ-আমেরিকাসহ অন্যান্য অগ্রসর দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে; তিনি বলেছেন, সেই 'অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই'। তাঁর বিশ্বভারতীর শিক্ষায় সব জ্ঞানের 'সংমিশ্রণ' ঘটুক তা তিনি অন্তর থেকে চাইতেন। তিনি বলেছেন, 'সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই।' '...চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে।' ২০ ফাল্গুন ১৩২৮ শান্তিনিকেতনে তিনি বলেছিলেন :

> ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্তেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এশিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয়নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *The Golden Book of Tagore*-এ আধা পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছেন আচার্য শীল।

১৯৩৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা দেয় ইন্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেস বা ভারতীয় দর্শন মহাসভা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেই সভায় সভাপ্রধান ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকার। দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রমুখ তাঁর জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশস্তিমূলক একটি কবিতা লিখে পাঠান। ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁকে একজন 'সত্যদ্রষ্টা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কবিতাটিতে তিনি বলেন :

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুগ্ধদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্খ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্যরাজ্যের জাগরণ,—
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী; সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হ'তে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো

বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।...

[*বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১, পৃ.১০৪]

ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক বাণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'I have lost an old friend for whom I always had a sincere affection and regard.' আমি একজন পুরোনো বন্ধুকে হারালাম। যার জন্য আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। এটি তাঁর কথার কথা ছিল না, মনেরই কথা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতটা হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল এবং তাঁদের মধ্যে দর্শন বিষয়ে কী ধরনের আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে ভালোমতো জানা যেত, যদি ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হতো। আচার্য শীল তাঁর আত্মস্মৃতি Reminiscences of My Life-এর পাণ্ডুলিপি মৃত্যুর অল্প আগে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে দিয়েছিলেন প্রকাশের ব্যবস্থা করতে। এ কথা আমি শুনেছি শান্তিনিকেতনে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের বড় ছেলে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রশান্তচন্দ্র অজ্ঞাত কারণে অমূল্য স্মৃতিকথাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেননি।

১৯৬৪ সালে ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি হয় কালিদাস নাগকে সভাপতি করে। কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন সাংবাদিক ও জীবনীলেখক মণি বাগচী (১৯০৭-১৯৮৩)। তাঁকে মহলানবিশ পাণ্ডুলিপিটি দেখতে দেননি। প্রকাশ করার কথা বলায় মহলানবিশ বলেছিলেন, 'বিনা সম্পাদনায় এ জিনিস ছাপা যাবে না।' তখন পাণ্ডুলিপিটি *বিশ্বভারতী*কে দেওয়ার অনুরোধ করলে তাতেও তিনি সম্মত হননি। প্রশান্তচন্দ্রের মৃত্যুর পর নির্মলকুমারী মহলানবিশকে মণি বাগচী ব্রজেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে বলায় তিনিও তাঁর স্বামীর মতো সম্মত হননি। সমসাময়িকদের সম্পর্কে কী এমন কথা ছিল যে যার জন্য পুরো স্মৃতিকথাটি অপ্রকাশিত থাকল আজও? তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা ছিল বলে সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় নির্মলকুমারীর কাছে শুনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-রাসেল সম্পর্ক

রবীন্দ্রবান্ধব কিছু ইউরোপীয় কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁদের বিপরীতে ছিলেন আর একদল, যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব খুবই কম। তাঁদের সংখ্যাটাই চিরকাল ইউরোপে বেশি। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সাহিত্য ও দর্শনের দুই মহারথী—আইরিশ নাট্যকার ও সমালোচক জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) এবং ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)। বার্নার্ড শ তাঁর A Glimpses of the Domesticity of Franklyn Barnabas শীর্ষক এক নকশাধর্মী রচনায় রবীন্দ্রনাথকে Stupendranath Begorr নামক এক চরিত্র সাজিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। [*Shaw, Stories, Scraps and Shavings,* p.159] অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তাঁর বিচারে 'নির্বোধেন্দ্রনাথ ভিক্ষুক', যিনি অশিক্ষিত হয়েও পাশ্চাত্যে গিয়ে খ্যাতি ভিক্ষা করে বেড়ান। বার্নার্ড শ'র এই অশালীন ও আপত্তিকর রচনাটি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিতে পড়ে। জীবৎকালে অসামান্য খ্যাতিমান শ খুব বড় লেখক, নাট্যকার এবং সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক ছিলেন, তবে বর্তমানে তিনি অনেকটাই ম্রিয়মাণ—রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ক্রমবর্ধমান।

কুড়ি শতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডের কবি-সাহিত্যিক মহলে ব্রিটিশের উপনিবেশিত ভারতের একজন মরমি কবি ও ভাবুক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু মূলত the love of God অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেম। ব্রিটিশ শিল্পী স্যার উইলিয়াম রোদেনস্টাইন এবং আইরিশ কবি ডবল্যু. বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯) ছিলেন তাঁর অনুরাগী। তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ইয়েটসের মন্তব্য—he is absorbed in

God—তিনি ঈশ্বরে আত্মীভূত বা সম্পূর্ণ নিমগ্ন। এ ধারণা শুধু ইয়েটসের নয়, সেখানকার প্রায় সবার; কারণ তাঁরা তখন পর্যন্ত শুধু ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত *Gitanjali* পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ধরনের কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক, বিশেষ করে তাঁর অপূর্ব রোমান্টিক কবিতাগুলো সম্পর্কে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। একটি উপনিবেশিত দেশের আঞ্চলিক ভাষার একজন কবিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর লেখকেরা কতটাই বা মূল্য দিতে পারেন!

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের মরমিবাদে কোনো নতুনত্বও খুঁজে পাননি তাঁর সমসাময়িক পশ্চিমি কবি ও বুদ্ধিজীবীরা। বিশেষ করে, তাঁরা লক্ষ করেছেন, ভারতবর্ষে ও চীনদেশে তাঁর বহু আগেই গভীর মরমি ভাবধারা ছিল। সন্ত কবিরের মরমিয়াবাদ রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের তুলনায় এজরা পাউন্ডের কাছে উন্নত বোধ হয়েছিল। ২২ এপ্রিল ১৯১৩, ইতালি থেকে এক চিঠিতে *Poetry*-র সম্পাদক হ্যারিয়েট মনরোকে তাঁর অভিমত লিখে পাউন্ড জানান :

> ধর্মগুরু হিসেবে তিনি বড় মাপের কিছু নন। আমাদের (চীনা দার্শনিক) লাও ৎসে রয়েছে। 'বেদনা ভোগ করেছে' অথবা পশ্চিমা সভ্যতার জ্বালা অনুভব করেছে, এমন সাধারণ মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথের দর্শনে তেমন কিছুই নেই। কথাটা আক্ষরিক অর্থে বলছি না, তবে তিনি ভিলোঁ (ফরাসি কবি) নন, তিনি লিওপার্ডিও (ইতালীয় কবি ও দার্শনিক) নন। আধুনিক মানুষের কাছে তাঁদের অন্তর্দৃষ্টির গুরুত্ব রয়েছে। **কবিতার বিষয়বস্তুর জন্য না হলেও কাব্যশৈলীর জন্য তাঁকে সমর্থন করা সম্ভব**। (কিন্তু) বেদ ও অন্যান্য (ধর্মগ্রন্থের) পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয়। তাঁর নিজের বাংলা ভাষায় ছন্দ ও ছন্দস্পন্দন এবং বক্তব্যের অভিনবত্ব তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু সেই কবিতার [ইংরেজি] গদ্য অনুবাদ 'শুধু থিয়োসফি' ছাড়া আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য, আমি কবিদের অনুবাদে যে মান অর্জনের চেষ্টা করছি, তিনি যদি তার চেয়ে কম কিছু চান, তাহলে তাঁকে রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এটা তাঁর নিজের ব্যাপার।
>
> [ডিয়ার এডিটর, পৃ.৬২]

কবি ও ভাবুক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ মৌলিকতা পশ্চিমের বিদ্বানসমাজের চোখে ধরা পড়েনি। বার্ট্রান্ড রাসেল দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ কবি এবং basically a mystic—মরমি ভাবুক। তা ছাড়া রাসেলের দর্শনচর্চা রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুর এবং তা আলোচনামূলক নয়, বিশ্লেষণমূলক। যুক্তি ছাড়া রাসেল আর কিছুই স্বীকার করতেন না—রবীন্দ্রনাথ যুক্তির চেয়ে

বিশ্বাস ও ভক্তি। জীবনের অর্থ অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে এক রকম, বস্তুবাদী রাসেলের কাছে অন্য রকম। রাসেল-হোয়াইটহেডের symbolic logic রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র আগ্রহের বিষয় নয়। মরমি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পশ্চিমে কারও কারও কাছে পরিচিতি a wise man from the East হিসেবে। কারণ তিনি আরও অনেকের মতো পশ্চিমে বহন করে নিয়ে যান Indian Spirituality বা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদ রাসেলের অতি অপছন্দের বিষয়।

রাসেল মনে করেন, একটি ভালো পৃথিবী গড়ে তুলতে প্রয়োজন জ্ঞান, দয়া ও সাহস; অতীত নিয়ে অনুতপ্ত হয়ে পড়ে থাকা নয়, অথবা সুদূর অতীতের অবিদ্য মানুষদের উচ্চারিত শব্দাবলি দিয়ে বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়োজন নেই। ('A good world needs knowledge, kindliness, and courage; it does not need a regretful hankering after the past; or a fettering of the intelligence of the words uttered long ago by ignorant men.') তাঁর এই বক্তব্য অযৌক্তিক নয়, কিন্তু ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

১৯১২ সালের জুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংল্যান্ড যান। সেটি ছিল তাঁর তৃতীয় বিদেশ সফর। ব্রিটেনের 'সমসাময়িক মনীষীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎসুক' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রোদেনস্টাইনের উদ্যোগে এইচ. জি. ওয়েলস, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। *গীতাঞ্জলি* প্রকাশিত হয় ১৯১০-এর সেপ্টেম্বরে। এর কবিতাগুলোর ইংরেজিতে গদ্য-অনুবাদ করেন কবি নিজেই। ইন্ডিয়া সোসাইটি *Gitanjali* প্রকাশ করে ১৯১২-তে। *গীতাঞ্জলির* ইংরেজির অনুবাদের মান নিয়ে ইংরেজি ভাষাভাষীদের প্রশ্ন ছিল।

রাসেলের দর্শনবিষয়ক দুটি প্রধান গ্রন্থ *Philosophical Essays* (১৯১০) এবং *Problems of Philosophy* (১৯১২) প্রকাশিত হয় এই সময়। A. N. Whitehead-এর সঙ্গে যৌথভাবে তাঁর *Principia Mathemetica* (তিন খণ্ডে) প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে। ১৯১২ নাগাদ রাসেল ইংল্যান্ডে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক।

যুক্তিবাদী রাসেলের ভারতীয় ভাববাদকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা নয়। তিনি খ্রিষ্টান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও খ্রিষ্টীয় ধর্মমতকেই মানতেন না। খ্রিষ্টীয় ধর্মমতকে তিনি কঠোর সমালোচনা পর্যন্ত করেছেন। খ্রিষ্টধর্মের শাসক ও যাজকদের অত্যাচার সম্পর্কে রাসেল তাঁর *Why I am Not a Christian* গ্রন্থে লিখেছেন :

> Christianity has been distinguished from other religions by its greater readiness for persecution. Buddhism has never been a persecuting religion. The Empires of the Caliphs were much kinder to Jews and Christians than Christian states were to Jews and Muhammadans. [p. 176]

স্বধর্মাবলম্বীদের ওপরও অত্যাচার-নির্যাতন খ্রিষ্টানরা খুবই করেছে। কোনো ধর্মীয় নীতিবোধ শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে—তা বিশ্বাস করতেন না রাসেল। তাই খ্রিষ্টান শাসক শুধু নয় যাজকদের প্রতি এবং traditional and institutional Christianity-র প্রতি বিরূপ ছিলেন রাসেল। তিনি বলেছেন, তুলনায় মুসলিম শাসক ও ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যথেষ্ট সহনশীল। শাসকের বিরোধিতা না করলে শুধু ধর্মীয় কারণে ইহুদি বা খ্রিষ্টানরা মুসলমান শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হয়নি। রাসেলের ভাষায় :

> It [Muslims] left Jews and Christians unmolested, provided they paid tribute. [P. 176]

ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানকার কয়েকজন খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় হয়। তখন বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষকতা করছিলেন। ১৯১২-র জুনের এক সন্ধ্যায় কেমব্রিজের এক উদ্যানে কিংস কলেজের অধ্যাপক নোয়েস ডিকিনসন, রাসেল ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কথাবার্তা হয়। *গীতাঞ্জলির* কিছু গান তিনি গেয়ে শোনান। সেই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে রাসেলের বক্তব্যও রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে একপর্যায়ে Tagore falls into silence—নীরব হয়ে যান। পরে তিনি ডিকিনসনকে বলেছিলেন যে, তিনি মুগ্ধ হয়ে রাসেলের কথা শুনেছেন—it had been wonderful to hear Russell talk. রাসেলের বক্তব্যের বিষয়বস্তু জানা না গেলেও অনুমান করা যায়।

কুড়ি শতকের প্রথম দশকের শেষদিকে গণিত ও দর্শনচর্চার সঙ্গে রাসেল রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু উদার গণতন্ত্রী ও নিরীশ্বরবাদী রাসেলকে লিবারেলরা ঠাঁই দেননি non-conformist ও agnostic হওয়ার কারণে। বেডফোর্ড নির্বাচনী এলাকা থেকে লিবারেল পার্টি থেকে মনোনয়ন চেয়েও তিনি পাননি তাঁর ধর্মীয় মতামতের জন্য। এর মধ্যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেওয়ার আহ্বান আসে principles of mathemetics-এর লেকচারার হিসেবে। ১৯১০ সালে রাসেল দ্বিতীয়বার কেমব্রিজে যোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথের বিলেত সফরের সময় রাসেল ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠিও দেন। সেই চিঠির জবাবে ১৩ অক্টোবর ১৯১২ রবীন্দ্রনাথ রাসেলকে যে চিঠি লেখেন তা এ রকম :

37 Alfred Place W
South Kensington, S.W.
13 October 1912

Dear Mr. Russell,

Thanks for your kind letter. I will ask Dr. Seal to pay you a visit at Cambridge, when you will have an opportunity to know him.

I read your article on the Essence of Religion in the last issue of the *Hibbert Journal* with very great interest. It reminded me of a verse in the Upanishad which runs thus–

'Yato veiche nivartante aprapya manasa saha
Anandam Brahmano Vidvan na vibheti Kutushchama.'

'From him words, as well as mind, come back baffled. Yet he who knows the joy of Brahman (the Infinite) is free from all fear.'

Through knowlege you cannot apprehend him; yet when you live the life of the Infinite and are not bound within the limits of the finite self you realize that great joy which is above all the pleasures and pains of our selfish life and so you are free from all fear.

This joy itself is the positive perception of Brahman. It is not a creed which authority imposes on us but an absolute realization of the Infinite which we can only attain by breaking through the bonds of the narrow self and setting our will and love free.

Yours sincerely
Rabindranath Tagore

[*The Autobiography of Bertrand Russell,* Vol. I, P. 221]

লক্ষ করার বিষয় যে রাসেলকে লেখা এই সংক্ষিপ্ত চিঠির ভেতরে অন্য কোনো দর্শনতত্ত্বের বিষয় নয়, ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ধর্মতত্ত্বের কথাই বেশি। রবীন্দ্রনাথ রাসেলকে জানাচ্ছেন যে *হিবার্ট জার্নাল*-এ প্রকাশিত রাসেলের 'ধর্মের সার' (Essence of Religion) প্রবন্ধটি তিনি অতি বেশি আগ্রহ নিয়ে পাঠ করেছেন। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে রাসেলের মতের সঙ্গে একমত

হতে পারেননি। উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তাতে তাঁর শুধু যে সমর্থন রয়েছে তা-ই নয়, তা তাঁরই মনের কথা। জ্ঞানের মাধ্যমে অনন্ত অসীম ব্রহ্মাকে পাওয়া যাবে না। ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করার যে আনন্দ তা রাসেলকে শোনাতে চেয়েছেন, কিন্তু তাতে এই যুক্তিবাদী ব্রিটিশ দার্শনিকের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। ঈশ্বর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধাহীন ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এই কথাতে :

> সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম, যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।
>
> অতএব, যখন আমরা যথার্থরূপে তাঁহাকে চাই তখন ব্রহ্ম বলিয়াই তাঁহাকে চাই। তিনি যদি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ না হইতেন তবে এই অসৎ সংসার, এই অন্ধকার হৃদয়, এই মৃত্যুবীজসংকুল সুখসম্পদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে চাহিতাম না। কেন তবে আমরা তর্ক করিয়া থাকি যে, আমরা অপূর্ণ জীব এবং তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অতএব তাহাকে আমরা পাইতেই পারি না। এবং সে জন্যই অসত্য অজ্ঞান এবং অন্ধবিশিষ্ট আকারকে কেন আমরা তাহার স্থানে আরোপ করি? আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই পূর্ণস্বরূপকে আমাদের একান্তই চাই, আমরা অপূর্ণ বলিয়াই সেই সত্য জ্ঞানমনন্তঃ ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র আনন্দ—একমাত্র মুক্তি।
>
> ['নিরাকার উপাসনা']

ধর্মের সার সম্পর্কে রাসেলের রচনা তিনি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেও তাঁর সঙ্গে একমত হওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরমসত্তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা তাঁর ভাষায় :

> আমাদের ব্রহ্ম কি কেবলমাত্র নীরস দর্শনশাস্ত্রের ব্রহ্ম? তাহা যদি হইত তবে কি ঋষিরা তাঁহাদের সমস্ত জীবন এই ব্রহ্মতে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে পারিতেন, তাঁহাদের সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ এই ব্রহ্মে গিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইত? প্রেমের ঈশ্বর কি বিদেশী ধর্মে আছে, আমাদের ধর্মে নাই? না, তাহা নয়। আমাদের ব্রহ্ম—রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। এই আনন্দ সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাদের বাঁচিয়া আনন্দ। এইজন্য পুষ্পে আনন্দ, সমীরণে আনন্দ। এইজন্য পুত্রের মুখ দেখিয়া আনন্দ, বন্ধুর মিলনে আনন্দ, নরনারীর প্রেমে আনন্দ। এইজন্যেই, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন। এই আনন্দকে পাইলে ভয় থাকে না, আনন্দের আকর ঋষিরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তবে কিসের

জন্য অন্যত্র যাইব? ঋষিদের উপার্জিত, ভারতবর্ষীয়দের উপার্জিত, আমাদের উপার্জিত এই আনন্দ আমরা পৃথিবীময় বিতরণ করিব। এইজন্য রামমোহন রায় আমাদিগকে আমাদেরই ব্রাহ্মধর্ম দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ব্রহ্ম যেমন নিকট হইতে নিকটতর, আত্মা হইতেও আত্মীয়তর, এমন আর কোনো দেশের ঈশ্বর নহেন। রামমোহন রায় ঋষিপ্রদর্শিত পথে সেই আমাদের পরমাত্মীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পথ দেখাইয়া দিয়েছেন।

[রামমোহন রায়]

যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সঠিক তা বলা যাবে না বটে, কিন্তু প্রাচ্যের ধর্মবিশ্বাস যে সঠিক নয়, তা-ও প্রমাণসাপেক্ষ নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরের কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক—না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধান করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গে সমস্ত জগতের যে মিল সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

['শান্তিনিকেতন', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পৃ.৭৬৩]

এক পরম ভাববাদীর কথা। এরপর আর তর্ক করা চলে না। এই কথার বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তির প্রয়োগ যেন অর্থহীন হয়ে যায়। যাদের বিশ্বাসে বস্তু মেলে, তর্কে তা বহু দূর।

রবীন্দ্রনাথের ওই চিঠি যখন রাসেল পান তখন তিনি দর্শনচর্চা নয় ব্যস্ত ছিলেন অন্য ব্যাপারে : ফিলিপ মোরেলের স্ত্রী লেডি অটোলিন মোরেলের সঙ্গে পরকীয়া প্রেমে মত্ত। তাঁর ঘর ভাঙিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে রাসেল তাঁর প্রথম স্ত্রী অ্যালিনকে তালাক দেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রাসেলের বা ব্রিটেনের বিখ্যাতদের মনোভাব যা-ই হোক, সেখানকার কম পরিচিতদের মধ্যে তাঁর অনুরাগী অনেকে ছিলেন এবং তা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির আগেই। চার্লস দারুইনের নাতনি ফ্রানসিস

কর্নফোর্ড (Francis Cornford) ১৯১২-র জুলাই মাসে 'ঋষিপ্রতিম' রবীন্দ্রনাথকে দেখে মুগ্ধ হয়ে রোদেনস্টাইনকে জানান :

> Now I can imagine a powerful and gentle Christ which I never could before.

তিনি দুঃখ করে বলেন : '[পশ্চিমে] রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন হয়েছে পরিমিত, পর্যাপ্ত নয়। [গীতাঞ্জলির] কয়েক পৃষ্ঠা পড়েছি, তারপর বই বন্ধ করে রাখি, বাকিটুকু পড়ব পরজনমে—feeling it too good for me.'

সেবার রবীন্দ্রনাথ চার মাস ইংল্যান্ডে ছিলেন—তিন মাস লন্ডনে এবং এক মাস রাজধানীর বাইরে স্ট্যাফোর্ডশায়ারে। খ্রিষ্টান মিশনারি সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। পরে অ্যান্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীর গভীর অনুরাগীতে পরিণত হন। ভারতে চলে আসেন এবং শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে থেকে যান আমৃত্যু। ১৯ অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ লন্ডন ত্যাগ করে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হন।

রাসেলের মেয়ে ক্যাথেরিন টেইট তাঁর *My Father Bertrand Russell* (London 1976)-এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাসেলের সাক্ষাতের কথা লিখেছেন। এই বই থেকে জানা যায়, লন্ডনের সাক্ষাৎকারটি মূলত রাসেলের উদ্যোগেই হয়েছিল।

কবির পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন যে একদিন রাসেল কেমব্রিজ থেকে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, Tagore, what is Beauty?

রথীন্দ্রনাথের এ তথ্যও ঠিক নয়। তিনি অন্য কেউ বা অন্য কোনো রাসেল হতে পারেন। ১৯৬০ সালে এই তথ্য রাসেলকে বলায় তিনি বলেন : 'টেগোর আমার সঙ্গে তিনবার দেখা করেন, আমি কখনো তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। তবে যখন দেখা হয় তখনো এ ধরনের কোনো কথা হয়নি। কীভাবে এ কথা চাউর হলো?' Tagore visited me three times, but I never visited him. I cannot imagine how this story came to be invented. সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা কখনো কোনো আলোচনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার কৃষ্ণা দত্ত এবং অ্যান্ড্রু রবিনসন জানান, রাসেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চারবার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম ১৯১২ ও ১৯১৩-তে দুইবার এবং ১৯২৬-এ শেষবার। এখন পর্যন্ত তাঁদের তথ্যই সঠিক।

১৯ জুন ১৯১৩, রাসেল তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অটোলিন মোরেলকে লেখেন :

> Here I am back from Tagore's lecture, after walking most of the way home. It was unmitigated rubbish–cut-and-dried

conventional stuff about the river becoming one with the Ocean and man becoming one with Brahma.

Sadana-য় রবীন্দ্রনাথের 'The realisation of Brahma' পাঠ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে রাসেল বলেন, এই রচনাটি স্রেফ আবর্জনা। এরপর থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলতে থাকেন। তবে তিনি মনে করতেন, মানুষটি আন্তরিক ও অকপট, যদিও পুরোনো কথাই শুধু কপচান তিনি। 'The man is sincere and in earnest, but merely rattling old dry bones. I spoke to him before the lecture– afterwards I avoided him.'

রাসেল বলেন, 'আমি দুঃখিত, টেগোরের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। অনন্ত অসীম ব্রহ্ম সম্পর্কে তাঁর কথাবার্তা অর্থহীন আবর্জনা ছাড়া কিছু নয়। এই-জাতীয় কথাবার্তা বহু ভারতীয় খুব পছন্দ করে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাস্তবিক পক্ষে তা কোনো অর্থ বহন করে না। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ আমার নেই।' 'I regret I cannot agree with Tagore. His talk about the infinite is vague nonsense. The sort of language that is admired by many Indians unfortunately does not, in fact, mean anything at all.'

অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও দর্শনতত্ত্ববিদ রাসেলের সঙ্গে ভাবুক রবীন্দ্রনাথের যত দূরত্বই থাকুক, তাঁদের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে নিবিড় মিল রয়েছে। তাঁরা উভয়েই শান্তিবাদী এবং বিশ্বকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁরা পরস্পরের খুবই কাছের। সামাজিক অন্যায়-অবিচার, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের তাঁরা ছিলেন ঘোর বিরোধী। শান্তিবাদী রাসেল ছিলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামী, বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনে তাঁর প্রভাব অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ কবি ও ভাবুক, তাঁর কাজ মানুষের মনোজগতের পরিবর্তনের জন্য প্রচার চালানো। যদিও তিনি তাঁর দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামীর ভূমিকা কিছু কম পালন করেননি, তবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর প্রভাব সামান্য। রবীন্দ্রনাথ ও রাসেলের লক্ষ্য অভিন্ন কিন্তু দুজনের কাজের ধরন ভিন্ন। তাঁদের দর্শনও একেবারেই আলাদা।

রবীন্দ্রনাথ ও ক্রোচে

১৯২৬-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইতালি সফরে গেলে ফ্যাসিবাদী শাসক মুসোলিনীর সরকার তাঁকে প্রায় রাজকীয় সম্মান দেয়। স্বয়ং মুসোলিনী তাঁর কবিতার প্রশংসা করেন, তিনিও করেন মুসোলিনীর তারিফ। মুসোলিনী ও ইতালীয় সম্রাটের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইতালিতে দেওয়া তাঁর বক্তব্যের কদর্থ করা হয় সে দেশের সংবাদমাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ বিব্রত হন এবং ইতালি থেকে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে তিনি ইতালির সংবাদপত্রের ভাষ্যের প্রতিবাদ করে যুক্তরাজ্যের *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান*-এ একটি চিঠি দেন। প্রগতিশীলরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রবিরোধীরা—তাঁর দেশে ও বিদেশে—ইতালি সফর নিয়ে তাঁকে নিন্দা করে প্রচুর লেখালেখি করেন—শুধু তখন নয়—বহুকাল ধরে।

ইতালির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে অধ্যাপক ফরমিসি ও ড. তুসির মাধ্যমে। ফরমিসির মাধ্যমেই তিনি বিশ্বভারতীর জন্য মুসোলিনির উপহার দেওয়া কিছু বই ও চিত্রকর্ম পান। সেই সঙ্গে মুসোলিনির একটি চিঠিও। তিনি আশা পোষণ করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের লক্ষ্যে বিশ্বভারতীতে একটি আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ কেন্দ্র স্থাপন করবেন। ফরমিসি ও তুসির আগ্রহেই রবীন্দ্রনাথ ইতালি সফর করেন। ওই সফরের আগে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী রাজনীতির চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। দূর থেকে মুসোলিনীর 'আকর্ষণীয়' ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করে। ইতালির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও তিনি ভাবেননি। সফরের আগে ফ্যাসিবাদবিরোধীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তা হয়নি। অন্যদিকে তাঁর সঙ্গে যাঁদেরই দেখা হয়েছিল, তাঁদের সবাই তাঁকে বলেছিলেন, 'ফ্যাসিবাদ ইতালিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়েছে।'

সফরের সময় ইতালির পত্রপত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়, তখন শান্তিপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ বিব্রত হন। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে স্বেচ্ছানির্বাসিত ফ্যাসিবাদবিরোধী বুদ্ধিজীবী প্রফেসর সালভাদোরির স্ত্রীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন, ইতালির জনগণ কী ভাবে, কী তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সেসব বিচারের অধিকার তাঁর নেই। তিনি বলেছিলেন :

> আশা করি তারা উপলব্ধি করবে, শুধু বস্তুগত বিত্ত তাদের মহান করবে না। বিশ্বে শুধু তখনই তারা হতে পারবে মহান শক্তি যখন তারা জগৎকে উপহার দিতে পারবে আত্মার চিরন্তন সম্পদ। তা না করে অর্জিত যে জাতীয় উন্নতি সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা, তা সবই ব্যর্থ হবে। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী নয়, যা কিছু আত্মার অমূল্য সম্পদ তা সকল কালের সকল দেশের।

মুসোলিনির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একটি রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলার উন্নতিই বড় অর্জন নয়, যদি তা মানুষের মুক্তির পথ তৈরি না করে—যে মুক্তির দরকার মহৎ সৃষ্টির প্রয়োজনে। তাহলেই বৈষয়িক ও অন্যান্য অগ্রগতি সার্থক, তা না হলে নয়।

ইতালিতে শুধু রাজনীতিকদের সঙ্গে নয়, রবীন্দ্রনাথ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। সেকালের খ্যাতিমান দার্শনিক ও লেখক বেনেদেত্তো ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) সঙ্গেও তাঁর একদিন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে আরও দু-একজন ভারতীয় বা বাঙালি পণ্ডিতের সঙ্গে ক্রোচের পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২) উল্লেখযোগ্য। চাকরিজীবনে দাশগুপ্ত প্রথম দিকে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২০-২২ সালে তিনি কেমব্রিজে ভারতীয় দর্শনের শিক্ষকতা করেন। তাঁর স্মরণীয় কীর্তি পাঁচ খণ্ডে রচিত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস—*A History of Indian Philosophy*। ভারতীয় দর্শনে তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। তাঁর *A Study of Patanjali, Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian Thought* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও দর্শন বিষয়ে রয়েছে তাঁর *Rabindranath : the Poet and Philosopher*. এ ছাড়া কয়েকটি বাংলা বইও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তবে সুরেন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচয়িতা—মৌলিক দার্শনিক নন। তিনি একবার ইতালিতে একটি দর্শন সম্মেলনে গিয়েছিলেন

এবং ক্রোচের দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে একটি বক্তৃতাও দেন তাঁর উপস্থিতিতেই। ক্রোচে প্রীত হন এবং সে কথা রবীন্দ্রনাথকে বলেন।

ক্রোচের দর্শনকে 'ঐতিহাসিক ভাববাদ'ও বলা হয়। সাহিত্য দিয়েই ক্রোচের শুরু, পরিণতি অর্জন করেন দর্শনে। তিনি নন্দনতত্ত্ববিদ, সাহিত্যসমালোচক, ইতিহাসের দার্শনিক এবং 'ইতালিয়ান আইডিয়ালিজম' বা ইতালীয় ভাববাদের একজন প্রধান মুখপাত্র। সাক্ষাতের আগে ক্রোচের দর্শন ও অন্যান্য রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা ধারণা ছিল, ওই দিন তিনি তাঁকে বলেন : এরপর আমি ইংরেজিতে অনূদিত আপনার বইগুলো পাঠ করব।

বস্তু ও মনের মধ্যে প্রধান শক্তি কোনটি? এই দার্শনিক প্রশ্নে ক্রোচে মনে করেন, বস্তু (Reality) হলো 'Spirit', তিনি বলেছেন, to be real, that is, is to play a part in one of mind's diverse activities. মনের বিচিত্র কাজ। তিনি সব রকম অলৌকিকতার (transcendence), অর্থাৎ যা মানুষের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় না, যা স্বজ্ঞালব্ধ, তার বিরোধিতা করেছেন। মানুষের আত্মার বাইরে আর কোনো সত্তা রয়েছে তা স্বীকার করেন না ক্রোচে। ইমানুয়েল কান্ট যাকে বলেছেন thing-in-itself, খ্রিষ্টধর্মে যা 'God' এবং প্রকৃতিবাদীরা যাকে বলেন Nature. ক্রোচে 'একজন নব্য-হেগেলীয়' বলে আখ্যায়িত হতেও অপছন্দ করতেন। (ক্রোচের দর্শন সম্পর্কে জানতে E. F. Carritt-এর অনূদিত তাঁর *My Philosophy* এবং H. Wildon Carr-এর *The Philosophy of Benedetto Croce* এবং R. Piccoli-র *Benedetto Croce : An Introduction to his Philosophy* পাঠ করা যেতে পারে।)

মানসিক ক্রিয়াই মন, মনের অস্তিত্ব নিহিত তার কর্মে। মনের কাজ দুরকম : তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। সৌন্দর্যবোধ হচ্ছে মানুষের আদিম বোধ। এ বোধ তার স্বজ্ঞাজাত। মানুষ তা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করতে পারে না। মানুষ তাঁর সৌন্দর্যের অনুভূতি প্রকাশ করে ভাষায়-রেখায় ও অন্যান্যভাবে। স্বজ্ঞার নানা রকম কাজ : শিল্পকলা, দর্শন, নীতিজ্ঞান, অর্থনৈতিক কর্ম প্রভৃতি।

ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে নয়, মূলত কথা হয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ নিয়ে। ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 'ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ধারণা আপনার সঙ্গে মেলে। ঈশ্বর সত্তাসমূহের মধ্যে বিরাজিত কোনো সত্তা নন, তিনি হচ্ছেন সব বস্তু বা অস্তিত্বগুলোর অস্তিত্ব।'

রবীন্দ্রনাথ বলেন, তিনিও তা-ই মনে করেন।

ক্রোচে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'জগৎকে দুটো অনতিক্রম্য কম্পার্টমেন্টে ভাগ করে দেখা সংগত নয়—যার একদিকে বস্তু, অন্যদিকে আত্মা (spirit)।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, আপনি আপনার লেখায় এ সম্পর্কে যথার্থই লিখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতালীয় দার্শনিকদের সিনথেসিস বা সংশ্লেষণের ক্ষমতার প্রশংসা করেন। তিনি নিজেও বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন। ক্রোচে বলেন, ইতালীয় দার্শনিকেরা বিশ্লেষণমূলক ফরাসি এবং জটিল বিমূর্ত জার্মান—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী দার্শনিক পথটি অবলম্বন করেন। ফলে ইতালীয় দর্শনজগতে গভীরতা থাকলেও আমাদের দার্শনিকেরা দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সহজবোধ্য হতে চান।

রবীন্দ্রনাথ ক্রোচেকে অনুরোধ করেন, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের দর্শনের মধ্যে একটি সংশ্লেষণ ঘটানো যায় কি না সে চেষ্টা করা উচিত। তিনি বলেন, ইতালীয়দের মধ্যে আমি একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছি, যা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নতুন কিছু সৃষ্টি করছে। আমরা ইতালীয় চিন্তাজগৎ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে চাই এবং বিষয়টি ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে আগ্রহী।

সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমি সভ্যতার বিরোধী ছিলেন না। পশ্চিমের উৎকৃষ্ট দিকগুলোর তিনি প্রশংসা করতেন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। এ প্রসঙ্গে তিনি ক্রোচেকে বলেন, একসময় আমরা ভারতীয়রা পশ্চিমি সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু বর্তমানে বস্তুবাদ ও বৈষয়িক দিকে সে এত ঝুঁকে পড়েছে যে প্রাচ্যে আগে তাকে যে মর্যাদা দেওয়া হতো তা সে হারাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থন জানিয়ে ক্রোচে বলেন, বস্তুতান্ত্রিকতা একেবারে ত্যাগ করা যাবে না, তবে পশ্চিমকে ভাববাদেও দীক্ষিত হতে হবে। এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মনকে পরস্পরের কাছে আনতে হবে, যদিও কাজটি কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ ক্রোচেকে একটি কঠিন প্রশ্ন করেন, আপনার দার্শনিক কাজ কি ইতালীয় মননের প্রকাশ, নাকি আপনার নিজস্ব প্রেরণাপ্রসূত। জবাবে ক্রোচে বলেন, তাঁর দার্শনিক চিন্তা ইতালীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। গোটা দক্ষিণ ইতালিতে যে দার্শনিক ঐতিহ্য প্রচলিত তাঁর দর্শন তার থেকে আলাদা তো নয়ই—তা বরং তার সঙ্গে গভীরভাবে সংলগ্ন। এ প্রসঙ্গে তিনি ডিকো ও ব্রুনোর উল্লেখ করে বলেন, ইতালীয় ভাববাদের তাঁরা উদ্ভাবক। ডিকোর দর্শনের ওপর ক্রোচের একটি গ্রন্থও রয়েছে।

পশ্চিমে যেসব দার্শনিকের সঙ্গে কথা বলে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ক্রোচে তাঁদের একজন। তবে ক্রোচের ভাববাদের ভিত্তি পশ্চিমি দার্শনিক ঐতিহ্য, রবীন্দ্রনাথের মরমি ভাববাদ প্রাচীন ভারতীয়, বিশেষ করে ঔপনিষদিক দর্শন। প্রাচ্যের লোকায়ত দর্শন দ্বারাও তিনি অনুপ্রাণিত হন।

রবীন্দ্র-বিশ্বদৃষ্টি : মানুষের ধর্ম

১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় ভারতীয় দার্শনিকদের মহাসম্মেলনে সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, তিনি নিজেকে কোনো 'তত্ত্বজ্ঞানী' বা মেটাফিজিশিয়ান মনে করেন না। তাঁর 'দর্শনশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা'র কথা স্বীকার করে বিনয়বশত আরও বলেছিলেন যে একদিকে তাঁর 'পাণ্ডিত্যরিক্ত মন', অন্যদিকে তিনি সেই মানুষ 'যিনি কোনো বিশেষ মতবাদের বশ্যতা স্বীকার করেন না'। তবে সেদিন এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে যাননি যে, কবির সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানী ও দার্শনিকের ভারতবর্ষে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাঁর কথায়, 'আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন কাব্য যাহা হোক—একটি একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত'।

কথাটি অসত্য নয়, কারণ প্রাচ্য দেশে কবিতায় ঢুকে পড়ে দার্শনিক তত্ত্ব, অন্যদিকে দর্শনের কঠিন বিষয়ও কাব্যের পাত্রে পরিবেশিত হয়।

ভারতীয় দর্শনকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিত যেভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেদিকে যাননি। তা তাঁর কাজও নয়। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ধর্মনেতা বা ধর্মসংস্কারকও নন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ বা দার্শনিকদের শ্রেণীভুক্ত তিনি নন। কিন্তু তিনিও তাঁর মতো একজন মৌলিক ব্রহ্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। অন্যদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি একেবারেই প্রথাগত নন, শিক্ষায়তনিক বা একাডেমিক তো ননই। মেটাফিজিকস বা সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত শাস্ত্রের, যাকে বাংলা ভাষায় তত্ত্ববিদ্যা বলা হয়, তার চর্চাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তবে তা একজন একাডেমিক দার্শনিকের মতো নয়। দর্শনের অধ্যাপকদের মতোও নয়, একজন সাধকের মতো। বরং বলা ভালো একজন তপোবনের ঋষির মতো। কিন্তু তিনি ঋষি ছিলেন না, ছিলেন একজন

সংসারী মানুষ, সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী। অজ্ঞাত নিভৃত স্থানে নয়, তিনি বাস করতেন এবং কাজ করতেন সমাজে মানুষের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদর্শন—Philosophy of life এবং বিশ্বদৃষ্টি—Worldview—অর্জন করেন পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তা আগেই বলা হয়েছে। তবে পিতাকে তিনি হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করেননি। উনিশ শতকের ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতাও তাঁর বিশ্বদৃষ্টি নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি নিজেও মনে করতেন, উনিশ শতকের তিনটি ভিন্নধর্মী আন্দোলন তাঁর বিশ্বদৃষ্টি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিনির্মাণে সহায়ক হয়। এই তিনটি যুগান্তকারী আন্দোলনের একটির সঙ্গে আরেকটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। আন্দোলন তিনটি হলো: ১. রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসমাজ ধর্মান্দোলন, যার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথও যুক্ত ছিলেন। ২. বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্য আন্দোলন। এবং ৩. ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, যাকে উপনিবেশিকতাবিরোধী 'প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন' বলা হয়।

কীভাবে তিনি বেড়ে উঠেছেন, কী প্রক্রিয়ায় তাঁর ভেতর ধর্মসাধনার উন্মেষ ঘটে অতি অল্প বয়সে, সে কথা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন তাঁর এক প্রবন্ধে। তাঁর ভাষায়:

> আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কার *বৈদিক মন্ত্র* দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে। আমি ইস্কুলপালানো ছেলে। যেখানেই গণ্ডি দেওয়া হয়েছে সেখানেই আমি বনিবনাও করতে পারি নি কখনো। যে অভ্যাস বাইরে থেকে চাপানো তা আমি গ্রহণ করতে অক্ষম। কিন্তু, পিতৃদেব সেজন্য কখনো ভর্ৎসনা করতেন না। তিনি নিজেই স্বাধীনতা অবলম্বন করে পৈতামহিক সংস্কার ত্যাগ করেছিলেন। *গভীরতর জীবনতত্ত্ব* সম্বন্ধে চিন্তা করার স্বাধীনতা আমারও ছিল। এ কথা স্বীকার করতেই হবে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য কখনো কখনো তিনি বেদনা পেয়েছেন। কিছু বলেন নি।
>
> বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। *সব-কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে*। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয়তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কেবল মাত্র মুখস্থ ভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত,

বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা; এক ধারায় মিলছে। এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করেছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে *আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে*। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।' [বাঁকা অক্ষরে আমার]

['মানবসত্য']

রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার সূচনা কীভাবে হয় তা এই বক্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে। আগের এক অধ্যায়ে তাঁর ধর্মসাধনা সম্পর্কে এবং রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর মনের মধ্যে যে জ্যোতি দেখা দেয় বারো-তেরো বছর বয়সে সেই জ্যোতি অনির্বাণ ছিল আমৃত্যু এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও প্রোজ্জ্বল হয়।

যখন তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তখন এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে প্রশ্ন উঠিয়াছিল— অশব্দমস্পর্শমসরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ—যাঁহাতে শব্দ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, এমন যে নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে আমরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের মধ্যে থাকিয়া লাভ করিতে পারি কিনা? তপোবনে অরণ্যচ্ছায়াতলে সেদিন তাঁহার এক সুগম্ভীর উত্তর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—
>
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি।
>
> তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা এ প্রশ্নের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সরল উত্তর আর কি হইতে পারে যে, আমি তাঁহাকে পাইয়াছি। যিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তিনি তাহাকে জানিয়াছেন। যিনি পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনি তাহাকে পাইয়াছেন, ইহা আমাদের আশার কথা। ইহার উপরে আর তর্ক নাই। তর্কের দ্বারা যদি কেহ প্রমাণ করিত যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় তবে তর্কের দ্বারা তাহার খণ্ডন সম্ভব হইতে পারিত, কিন্তু অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে নির্জন ধ্যানাসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মবাদী মহর্ষি বিশ্বলোককে আহ্বানপূর্বক এই এক মহা সাক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে —বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি।
>
> সেই সত্যবাণী আজিও সমস্ত দেশকালকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত তর্কসংশয়কে অভিভূত করিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণের নিকট উত্থিত হইতেছে।
>
> ['নিরাকার উপাসনা']

এই প্রশ্ন শুধু ভারতে ওঠে নাই, যিনি সমগ্র জগৎব্যাপী, তাঁর সম্পর্কে পৃথিবীর নানা স্থানেই—সম্ভবত মানবসমাজের সর্বত্রই প্রশ্ন জেগেছিল। এ এক অতি পুরোনো প্রশ্ন। চার হাজার বছরেরও আগে বর্তমান ইরাকের 'উর' নামক স্থানের ধর্মসাধক ইব্রাহিমের কাছেও সেই নিরাকার ব্রহ্ম দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন: আমি সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইব্রাহিমের সেই পরব্রহ্মচেতনা থেকেই মুসা নবীর ইহুদি ধর্ম, যিশুখ্রিষ্টের খ্রিষ্টধর্ম এবং হজরত মোহাম্মদের ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি। যেমন ভারতবর্ষে বৈদিক ঋষিদের থেকে বৈদিক হিন্দুধর্মের উৎপত্তি, যে সনাতন ধর্মের ওপর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল অবিচল। যদিও সেই ধর্মাবলম্বীদের সব আচার-আচরণ, ধর্মনেতাদের সব উপদেশ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা অন্ধের মতো অনুসরণ করতে তাঁর স্বাধীন মন সায় দেয়নি। সবকিছু গ্রহণ করতে পারেননি 'সকল মন দিয়ে', নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে সন্ধান করেছেন সত্যের এবং জেনেছেন সেই 'মহান পুরুষকে'।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু জগতে মানুষ অসংখ্য সম্প্রদায়ে ও গোত্রে বিভক্ত। প্রত্যেকে ঈশ্বরকে কল্পনা করেছে তাদের নিজের মতো করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

> মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাতনতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাঁহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।
>
> নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহাকিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই, যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন—অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরল প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগদিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।
>
> আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইয়া গেলে, হয়

আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

['ধর্ম প্রচার']

উপনিষদের ঋষিচিত্ত তার সর্বোচ্চ মহিমা নিয়ে রবীন্দ্রমানসে প্রতিফলিত। শুধু তিনি নন, উপনিষদের ভাবধারায় আপ্লুত দেবেন্দ্রনাথের গোটা পরিবার। শৈশবেই প্রকৃতিবিজ্ঞানের সংস্পর্শেও আসেন তিনি। বিজ্ঞানের ওপর তাঁর আস্থা অবিচল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রদীপই মানবজীবনের চলার পথে একমাত্র আলো—তা তিনি স্বীকার করেননি। বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে যোগ করেন তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা। বিজ্ঞানের বস্তুবাদের সঙ্গে সমন্বয় করেন অতিন্দ্রীয় উপলব্ধি ও মরমি ভাববাদের। এই সমন্বয়ে কোনো ভাবসংঘাতের সৃষ্টি হয় না। তাঁর ভাববাদ বস্তুবাদের সঙ্গে মিলেমিশেই চলে, কেউ কাউকে আঘাত করে না।

অবশ্য রবীন্দ্রকাব্য ও দর্শন-বিশ্লেষক আবু সায়ীদ আইয়ুব মনে করেন :

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করলেন যে-সব কারণে তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। একটি প্রশ্ন প্রথমেই জাগে—তিনি কি আদৌ অনুগত ছিলেন? প্রশ্নটি অমূলক নয়। 'আত্মপরিচয়'-এর ১১৩ পৃষ্ঠায় পড়ি "জন্মকাল হতে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি।" ব্রাহ্মধর্ম অবশ্য জীর্ণ যুগের উত্তরাধিকারে পাওয়া ধর্ম নয়, তবু তার প্রতিষ্ঠা তো মূলত খ্রীষ্টপূর্ব যুগে রচিত উপনিষদ থেকে সংকলিত শাস্ত্রবচনের উপরেই। কথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় *The Religion of Man*-এ :

"It was though an ideosyncracy of my temperament that I refuse to accept any religious teaching merely because people in my surrounding believed it to be true."

আগেই বলেছি যে আধুনিককালের মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে ক্রমোন্নত ধর্মবোধের মিতালিতে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান ছিলেন, বুদ্ধি ও বুদ্ধি-প্রসূত জ্ঞানের একাধিপত্য না-মানলেও এমন কোনো ধর্মমত তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যা বুদ্ধিকে খর্ব বা খণ্ডিত করে।

[*পাত্থজনের সখা*]

ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মকে রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, পশ্চিমের অন্যান্য বড় একেশ্বরবাদী ধর্ম থেকে তার পরিসর অনেক বড়। তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিকস হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজে কোনো বিশেষ অংশে

তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম আমোদ হইতে, কাব্য কলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপ ধর্মগৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে যাহা অধর্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল—ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতার দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্মউপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

['ধর্ম প্রচার']

নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসীর স্বরচিত ধর্মের মতো নয়, প্রাচীনকালের তপোবন ঋষির মতোও নন, একজন আধুনিক সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রেমের দ্বারা মানুষে মানুষে মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সত্য ও প্রেমের ওপর তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন :

সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

['উৎসব']

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন প্রাচ্যে প্রচলিত ধারণা থেকে আলাদা, তা ভারতীয় দর্শনের ভাষায় ব্যক্তির মোক্ষ লাভ নিয়ে ব্যাকুল নয়। তাঁর ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে, তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে, সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ, তাঁর স্বদেশ-চিন্তাও ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। তিনি বলেন :

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা কিছু তাহা তাহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন, তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত, তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।'

['ধর্মের সরল আদর্শ']

রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব অতি সরল, তাতে ভাবের গভীরতা আছে, কিন্তু জটিলতা কিছুমাত্র নেই। যখন তাঁর বয়স ৪২ এবং অল্পকাল আগেই স্ত্রী গত হয়েছেন, তখন তিনি লিখেছেন :

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম।...তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদযোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

['ধর্মের সরল আদর্শ']

রবীন্দ্রনাথ অস্পষ্টতা, জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার ঘোর বিরোধী। তাঁর কবিতার কথা শুধু সুন্দর নয় এবং তার ভাব যত উঁচুই হোক—তা সুবোধ্য। তাঁর গানের কথা ও সুর সহজ, সকলেই তা উপলব্ধি করতে পারে ও গাইতে পারে। তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে জীবনের সুখ-দুঃখের গভীর বিষয়ও সরল ভাষায় এঁকেছেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ও বক্তব্য সুস্পষ্ট। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সেই রচনাকেই তিনি সবচেয়ে মূল্য দিয়েছেন যা সহজবোধ্য, যা সহজেই সাধারণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর মতে :

যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে। যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন উপকরণ বহুলবিস্মৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

['ধর্মের সরল আদর্শ']

রবীন্দ্রনাথকে একজন প্রথাগত ধার্মিক হিন্দু তো নয়ই, ব্রাহ্ম-হিন্দুও বলা যাবে না। আগের এক অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাঁর ধর্মদর্শনের ভিত্তি উপনিষৎ হলেও তাঁর ধর্ম যেন একমাত্র তাঁরই ধর্ম, জগতের কোনো প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে যার মিল নেই। যদিও তাঁর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ইসলামি

বা কোরআনের দর্শনের কোনো বিরোধ নেই। তা ছাড়া ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব, খ্রিষ্টধর্মের প্রেমধর্ম এবং বৌদ্ধ মানবতাবাদে তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল।

রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈত ও দ্বৈত নিয়ে কথা 'কাটাকাটি' বা 'মারামারি' করার পক্ষেও নন। কারণ তাঁর ভাষায়, 'তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী। হ্যাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হ্যাঁ-কে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী।' ['সামঞ্জস্য'] উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করেছেন। যিনি এক, তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজনসকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান হয়েই তিনি থাকেন।' [ঐ]

রবীন্দ্রনাথ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারতীয় 'দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ, তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না এক সঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ।' [ঐ]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্থির বিশ্বাস থেকে বলেছেন, 'তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।' কারণ তিনি বলেছেন :

> সংসারের সবকিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়।...পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

অদ্বৈত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন, যা রবীন্দ্রদর্শনের অন্যতম প্রধান বক্তব্য :

> এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।
>
> ['সামঞ্জস্য']

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'আমাদের আত্মার যে সত্যসাধনা তার লক্ষ্য' 'পরিপূর্ণতার দিকে—এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন, এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।'

['সামঞ্জস্য']

আত্মোপলব্ধি ও বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ মূল্য দিয়েছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যকে তিনি আরও মূল্য দিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের মতো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। সে জন্য বিজ্ঞানের সাধনার ওপরও জোর দিয়েছেন :

> মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়েছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপন করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।
>
> ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।
>
> [*রবীন্দ্র-রচনাবলী*-৭, পৃ.৭৪৩-৪৪]

রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই ইউরোপের দার্শনিক জ্ঞান ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে ঢুকে পড়েছিল। ইংরেজি-শিক্ষিতদের অনেকে মনে করেছেন, ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান অচল হয়ে গেছে, ইউরোপীয় আদর্শই মুক্তির পথ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, সে পথ ভ্রান্ত। ইউরোপীয় আদর্শ থেকে স্বাভাবিকভাবে যেটুকু আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়, তা গ্রহণে আপত্তি নেই। কিন্তু জবরদস্তি করে সেখানকার আদর্শ গ্রহণ ভারতবাসীর জন্য কল্যাণকর হবে না। তাঁর ভাষায় :

> ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায়নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি-দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।
>
> [*রবীন্দ্র-রচনাবলী*-৭, পৃ.৭৪৬]

কঠিন সাধনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের মহত্তম আদর্শকে যুগের উপযোগী করে তোলার মধ্যেই ধর্ম-বর্ণ-জাতিনির্বিশেষে ভারতের মানুষের মুক্তি অর্জন সম্ভব—সেটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অনড় প্রত্যয়। ভারতের অদ্বৈততত্ত্ব, অহিংসা, বিশ্বমৈত্রী সর্বমানবের মুক্তির পথ। তাঁর মতে, ভারতের আদর্শ কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক আদর্শ নয়। পৃথিবীর যেকোনো স্থানের সব জাতির সত্যকে ভারত ধারণ করতে সক্ষম। ভারতবর্ষের আদর্শের সর্বলৌকিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না। তিনি বলেন :

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিকবৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। **ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।** ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদ রূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

[*রবীন্দ্র-রচনাবলী*-৭, পৃ.৭৪৭]

১৯৩৩-এর ১৬-২০ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'কমলা বক্তৃতা' দেন। তার আগে ১৯৩০-এর মে মাসে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে দিয়েছিলেন 'হিবার্ট-বক্তৃতা'। সে বক্তৃতার শিরোনাম ছিল The Religion of Man। ১৯৩১-এ সেটি যখন সংশোধন ও সম্পাদনা করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় তার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে লেখাগুলোতে—

> ...contain also the gleanings of my thoughts on the same subject from the harvest of many lectures and addresses delivered in different countries of the world over a considerable period of my life.
>
> The fact that one theme runs through all only proves to me that the Religion of Man has been growing within my mind as a religious experience and not naively as a philosophical subject. In fact, a very large portion of my writings, beginning from the ealier products of my inmature youth down to the present time, carry an almost continuous trace of the history of

this growth. Today I am made conscious of the fact that the works I have started and the words that I have uttared are deeply linked by a unity of inspiration whose proper difinition has often remained unrevealed to me.

'ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ সারসংকলন বা সম্প্রসারণ বাংলা' নয় তাঁর *মানুষের ধর্ম*, তবে বিষয়বস্তু এক। *মানুষের ধর্ম*-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।
>
> কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তা হলে এর জন্য সাধনা করতে হতো না।
>
> 'আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষের উপলব্ধি সর্বত্র সমান নয় ও অনেক স্থলে বিকৃত বলেই সব মানুষ আজও মানুষ হয়নি। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ নিয়ত মানুষের অন্তর থেকে কাজ করছে বলেই আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানুষের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—
>
> স দেবঃ
>
> স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।
>
> সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।

মানুষের ধর্ম-এ তিনি বেদ-উপনিষদের দর্শন অবলম্বন করে নিজের কিছু উপলব্ধির কথা যোগ করেছেন। এখানে যা বলেছেন, সেসব কথা আগেও তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, অভিভাষণে বিশেষ করে 'শান্তিনিকেতন'-এর রচনাবলিতেও আছে। *মানুষের ধর্ম*-এ আগের রচনার পুনরুক্তি প্রচুর। এখানে মূলত তিনি মানবপ্রকৃতি ও প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর কবিসত্তা ও দার্শনিকসত্তা একত্র হয়েছে। তিনি বলেছেন :

> ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে স্বভাবকে পাওয়া, কথাটা শোনায় স্ববিরোধী অর্থাৎ স্বভাবকে অতিক্রম করে স্বভাবকে পাওয়া।

খৃষ্টানশাস্ত্রে মানুষের স্বভাবকে নিন্দা করেছে; বলেছে, তার আদিতেই পাপ, অবাধ্যতা। ভারতীয় শাস্ত্রেও আপনার সত্য পাবার জন্যে স্বভাবকে অস্বীকার করতে বলে। মানুষ নিজে সহজে যা তাকে শ্রদ্ধা করে না। মানুষ বলে বসল, তার সহজ স্বভাবের চেয়ে তার সাধনার স্বভাব সত্য। একটা স্বভাব তার নিজেকে নিয়ে, আর-একটা স্বভাব তার ভূমাকে নিয়ে।

তিনি আরও পরিষ্কার করে বলেন :

মানুষের স্বভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে। ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন। যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন।

জীব হিসেবে মানুষ অন্য হাজারো প্রাণীর মতো নয়। জগতের অন্য কোনো প্রাণী সাধনার দ্বারা উন্নততর হয়ে উঠতে পারে না, মানুষ পারে। তিনি বলেন, মানুষ জন্মগতভাবে যে স্বভাব নিয়ে পৃথিবীতে আসে সেটাই তার প্রথম ও শেষ স্বভাব নয়। সাধনার ভেতর দিয়ে সে অর্জন করে উন্নততর স্বভাব—ঘটে তার স্বভাবান্তর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা। ব্যক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে তার বিজ্ঞান। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবে বিশ্বগত কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হতে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাব আবরণ, অন্য স্বভাব মুক্তি।

[*মানুষের ধর্ম*]

রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। যে মানুষ সত্যিকারের ধর্মের সাধনা করে যে সত্যেরই সাধনা করে, অন্যদিকে যে সত্যের সাধনা করে সে ধর্ম পালনই করে। তাঁর ভাষায় :

সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তারই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ তারই ধর্ম।

[মানবধর্ম]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে সাম্প্রদায়িক ভেদের একেবারেই স্থান নেই, তা সর্বজনীন, তা সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তাঁর মানবধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট :

এতকাল ধর্ম ছিল সম্প্রদায়কেন্দ্রিক, সেই সম্প্রদায়গুলো আবার বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত, পরস্পরের ঈশ্বরই মানুষের মিলনের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ধর্ম আসলে একটাই—তা হচ্ছে মানবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলায় না।... সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত ভবিষ্যৎ।... অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম।'

প্রাণিজগতে মানবজীবন বড়ই অমূল্য জীবন। তার জীবন মূল্যবান হয়ে ওঠে মহৎ কাজের দ্বারা। তার দায়িত্ব বিরাট। সেই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে তাঁর জীবনের সার্থকতা এবং ধর্ম পালনের সার্থকতা। তিনি বলেন :

> মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়। মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে, এই-যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—
>
> মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

রবীন্দ্রনাথ কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, তিনি স্বাধীন, সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে পথচলার আকাঙ্ক্ষা তাঁর। তিনি মুক্ত—কোনো মতবাদের বা শাস্ত্রের প্রাচীরে আবদ্ধ নন। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দার্শনিক ও ধর্মসাধক রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> দলে উপেক্ষিত আমি
> মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
> যে মানুষের অতিথিশালায়
> প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।
> ... .
> হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
> পরিত্রাণ করো
> ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা
> সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
> হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
> তামসের পরপার হতে
> আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।
>
> [পনেরো সংখ্যক কবিতা, *পত্রপুট*]

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে আমরা মানুষের ধর্মই বলব, তিনি নিজে নাম দিয়েছেন 'মানবধর্ম'। অবাস্তব হলেও তিনি এমন একটি ধর্মের কল্পনা করেছেন যেখানে কোনো মানুষ জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'-এ ঠিকই বলেছেন, 'অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা' নীতিগুলোই রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের মূল বিষয়। প্রবোধ সেন তাঁর আরেকটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা'য়ও বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে মানুষ সংস্কার ও প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

সব ধর্মেরই যুগের উপযোগী সংস্কারে বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি চেয়েছেন, নতুন যুগের জন্য এক নবধর্মের আদর্শ প্রচারিত হোক। তাঁর নিজস্ব ধর্মীয় বোধের ব্যাখ্যা তাঁর ভাষায় এ রকম :

> আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন-সংগীতের সুর মিলিবে না, কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।
>
> ['নবযুগের ধর্ম', *সঞ্চয়*]

বিভিন্ন ধর্মীয় শাস্ত্র তিনি যথেষ্টই পাঠ করেছেন, কিন্তু সত্যিকারের পাঠ নিয়েছেন জীবন থেকেই। বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের সঙ্গে তিনি মিশেছেন। ফলে, তিনি উপলব্ধি করেন, 'বাইরে আছে নানান দেশের নানান সমাজে নানা জাতি, অন্তরে আছে এক মানব।' ['মানবধর্ম'] এ কথা সেই আগের কালের বাঙালি কবিরই কথা—'নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ, জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।'

খুবই তাৎপর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এক ও অভিন্ন বিশ্বধর্মের কথা বলেননি, তিনি বলেছেন মানবধর্মের কথা—মানুষের ধর্মের কথা।

ধর্মপ্রবর্তকদের সম্পর্কে অভিমত

প্রাচ্যের তিনটি সবচেয়ে বড় সংঘবদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক তিনজন মহাপুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে মূল্যায়ন তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর জীবনদর্শন বোঝার জন্য তাঁর সেই বিবেচনার মূল্য রয়েছে। বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ও ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধগুলোকে তিনি খুবই মূল্য দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্মের অন্তঃস্থিত যে নৈতিক শিক্ষা তার মূল্যই তাঁর কাছে খুব বেশি—ওই সব ধর্মের শাস্ত্র ও প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানগুলো নয়। তলস্তয়ের ধর্মের সারতত্ত্ব বা 'এসেন্স অব রিলিজিয়নস' আর রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্মে'র মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। গৌতম বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট ও হজরত মুহম্মদ সম্পর্কে তাঁর যে মূল্যায়ন—অতি সংক্ষেপে হলেও—তার তাৎপর্য অসামান্য। তাঁদের মূল ধর্মশিক্ষাও যে তীর্থযাত্রা ও প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে, সে দিকটিতেই জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মোটের ওপর দেবেন্দ্রনাথেরও ধর্মচিন্তা ছিল সে রকম। তাঁর ভাষায় :

> বিশেষ স্থানে গিয়ে বিশেষ মন্ত্র পড়ে বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করার জন্য এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে, তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে—মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল।
>
> য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়ম পালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য

ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদিদের ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয়—সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তি দ্বারাই ধর্ম সাধনা হয়—বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনামাত্রই সকলকে বলতে হয় যে, হ্যাঁ। কিন্তু এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্য যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুশের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মুহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেননি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে। চারিদিকের শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যারা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ [বুদ্ধ, যিশুখ্রিষ্ট ও মুহম্মদ] সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো, সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে না, এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে, সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগদিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চার দিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না।

সেইজন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারি দিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে, **পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব**—আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারি দিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে, এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

['ভক্ত', শান্তিনিকেতন, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ৭, পৃ.৭৫৬]

তিনি আরও বলেন :

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

['শান্তিনিকেতন', প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬১]

তত্ত্বজ্ঞানের বইয়ের শুকনো পাতায় ব্রহ্ম আবদ্ধ নন, তিনি আছেন এই মহাজগতের সবকিছুর সঙ্গে—সকলের সঙ্গে। সংসার ত্যাগ করে, সুখ-দুঃখময় এই জগতের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে আলাদা করে 'সেই অনন্তস্বরূপ'কে পাওয়া যাবে না। সকলকে আপন করে পেলেই তাকে পাওয়া হবে বলে বিশ্বাস করেন রবীন্দ্রনাথ :

সেইজন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে, বাদ দিয়েই, সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

['শান্তিনিকেতন', প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬৭]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্চা তাঁর ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান পাপ-পুণ্য অর্জনের আশা বা লোভ থেকে নয়, তার সঙ্গে তাঁর স্বদেশের কল্যাণের প্রশ্নও জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনা তাঁর দেশের কল্যাণসাধনার অংশ। তাঁর ধর্মসাধনার এটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেছেন :

> একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বার বার কেবলই আঘাত পেতে থাকব, কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।
>
> আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। কিন্তু তার একটিমাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি, 'সর্বগতঃ শিবঃ'... তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বলো এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না, তা হলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভালো। যদি বলো এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তা হলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে।
>
> ['শান্তিনিকেতন', প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭২]

নিজেকে নিপীড়নের মাধ্যমে কঠিন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়ার যে চেষ্টা তাকে মোটেই গুরুত্ব দেননি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ভাষায় :

> অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে—তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে।...

তিনি জোর দিয়েছেন মানুষে মানুষের মিলনের ওপর। তিনি বলেন, মিলতে গেলে সহজ হতে হয় :

> ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে।
>
> ['রসের ধর্ম']

ভারতবর্ষে এক সময় সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম কঠিন আকার ধারণ করেছিল। শাস্ত্রের বাইরে এক চুল এদিক ওদিক হওয়ার সুযোগ ছিল না

সাধারণ মানুষের। মানুষের সহজাত স্বভাব নয়—শাস্ত্রই সবকিছু। সেই সময় দেখা দেয় বিভিন্ন ভাবান্দোলন। আবির্ভাব ঘটে কবীর, নানক, চৈতন্যদেবের মতো মানুষের, যাঁদের কাছে শাস্ত্র বড় নয়—মানুষ বড়। শাস্ত্রের কাঠিন্যের পরিবর্তে তাঁরা পরিবেশন করলেন রস। ভক্তিরসে প্লাবিত হলো ভারত, মানুষ শিখল মানুষকে ভালোবাসতে, মানুষকে ভালোবাসার মধ্যে সন্ধান পেল ঈশ্বরের ভালোবাসার। অতীতেও মহামানবরা সেই কাজটিই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খ্রীষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতিতে স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।
>
> বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করেনি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।
>
> তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনই সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলেনি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলেনি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলেনি।
>
> ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমনকি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ

করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তার সঙ্গে মিলন হয়, আর কিছুই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

['রসের ধর্ম', *শান্তিনিকেতন*]

রবীন্দ্রনাথ শুধু সত্য নয় সুন্দরেরও উপাসক। তাঁর জিজ্ঞাসা যে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে ব্যাকুল, সে মানুষে মানুষে মিলিত হতে অনিচ্ছুক হবে কেন? আচার, পূজা-অর্চনা, তত্ত্বজ্ঞান মানুষ মেলায় না, তা মানুষে মানুষে রচনা করে ব্যবধান। ধর্মসাধনায় আনন্দ ও রসের দিকটির প্রতি তিনি খুব বেশিই জোর দিয়েছেন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার উপায় বা ব্যবস্থা ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে করে দিয়েছেন। তিনি নিজে প্রকাশ্য নন—গুপ্ত, তাঁকে জানার জন্য যদি মানুষের আন্তরিন্দ্রিয় না থাকত তাহলে মানুষের পক্ষে তাঁকে জানা সম্ভব হতো না। 'যিনি লুকানো আছেন' তাঁকে খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতামত :

> উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং—গহ্বরেষ্ঠং—অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে—তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যই আমাদের গভীরতর আন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।
>
> ['গুহাহিত', *শান্তিনিকেতন*]

স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য ভক্তের যে অন্তহীন চেষ্টা, তাঁকে খোঁজার পদ্ধতি ও পথটি যে কত বিচিত্র, তাতে যে বারবার মানুষ ভুল করে, তাকে রবীন্দ্রনাথ অর্থহীন ব্যাপার মনে করেননি। স্রষ্টাকে অন্বেষণের জন্য মানুষের সহজাত 'অন্তর্নিহিত শক্তি' ও তার তৎপরতার মূল্য তাঁর কাছে অসামান্য। তাঁর ভাষায় :

> এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর বলে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই বলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে

না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে যে সত্য বলে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জাল ফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলেছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে—কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার—আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয় পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

['গুহাহিত', *শান্তিনিকেতন*]

মানুষ এমনই প্রাণী, যাকে এক জীবনেই বারবার জন্ম নিতে হয়, শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবে নিজের রূপান্তর ঘটাতে হয়, নিজেকে অতিক্রম করতে হয় সাধনার দ্বারা। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের কবি ও দার্শনিক সত্তা একাকার হয়ে যায়। তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনে মানবজন্ম লাভের অনুভূতি প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়—তেমনি মানুষকে বার বার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

অনুশীলন, কর্ম ও সাধনার দ্বারা এক জীবনেই মানুষের মধ্যে জন্মান্তর ঘটে। তিনি বলেন :

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

['জন্মোৎসব', *শান্তিনিকেতন*]

যখন মানুষ নিজের 'মহত্তর সত্তা'কে উপলব্ধি করতে পারে তখন তার 'নবজন্ম' হয়। বিষয়বুদ্ধি নয়, স্বার্থবুদ্ধি নয়, 'মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা' পরিচালিত হলে সেই নবজন্ম সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি।

['জন্মোসব', *শান্তিনিকেতন*]

এই বিশ্বজগৎ এক মহানিয়মে আবর্তিত। সেই নিয়মের একচুল এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। এক কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া এই কঠিন নিয়ম ও 'সামঞ্জস্যের লীলা' চলতেই পারত না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মরমি ভাববাদীর ভাষায় :

> এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হোক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হোক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারি দিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা'।
>
> ['সামঞ্জস্য']

ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য মানুষের সাধনার পথটি দীর্ঘ ও বিচিত্র। বৈদিক 'যুগ থেকে শুরু' করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ কখনো মন্ত্র পাঠ করে, পশু বলি দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে সেই পরম পুরুষের করুণা প্রার্থনা করেছে। কখনো জ্ঞানের মাধ্যমে, কখনো অনুধ্যানের মাধ্যমে, কখনো ভক্তির দ্বারা তাকে পাওয়ার সাধনা করেছে। কোনো সাধনাই বিফলে যায় না। কখন সাধক কোন উপায়ে তাঁর সান্নিধ্য পায় তা বলা যাবে না। সুতরাং কোনো পথই অগ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন :

> একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, এই ধারণাটি একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যার সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদবৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করেনি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমনকি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনাকর বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।
>
> ['সামঞ্জস্য', *শান্তিনিকেতন*]

ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানীর একার একচেটিয়া সম্পদ নয়, তা যেমন বিতরণযোগ্য জিনিস তেমনি তা ব্যক্তির উপলব্ধিরও বিষয়। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের ভেতর দিয়ে উপলব্ধির ওপরই জোর দিয়েছেন :

> জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী?
>
> কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ কথা বুঝেছেন—ব্রহ্মকে পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়—শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি : রসো বৈ সঃ।'
>
> ['সামঞ্জস্য', *শান্তিনিকেতন*]

সত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোনো তারতম্য ঘটে না। যা সত্য তা সকল কালের সকল দেশের জন্যই সত্য। বহিরাগতদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে যেসব সত্য এসেছে, ভারতের সত্য সাধকেরা তাকে মূল্যহীন বলে অবহেলা না করে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। তাতে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর হয়েছে ভারত। রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কিরকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।
>
> ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।'
>
> ['ব্রাহ্ম সমাজের সার্থকতা']

শাস্ত্রজ্ঞানের চেয়ে আত্মজ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নিরন্তর জ্ঞানের সাধনার মাধ্যমে, বাউলদের ভাষায় যিনি 'মনের মানুষ' তাঁকে পাওয়ার ব্যাকুলতা তাঁর। তাঁর ভাষায় :

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে **মানুষের তিনি মনের মানুষ;** তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে : আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। কোথায় পাব তারে! কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া; আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

'আত্মবোধ' শীর্ষক রচনাটির সারকথা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ অব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তাঁর এক অনুরাগী নির্মলচন্দ্র দে-কে লিখেছিলেন :

...ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্রই পরিপূর্ণ—কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্মই লোপ পাইত।...প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়।...অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে পরিপূর্ণমাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত-যোগ দেখা যায় নাই; কোথাও বা জ্ঞান প্রবল, কর্ম প্রবল নহে—কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে—সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা। মানুষ আপনার বুদ্ধি প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্র পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে,—এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে;...

[*রবীন্দ্র রচনাবলী* ৮, পৃ.৭৮৪]

জাপানে দর্শন প্রচার ও প্রতিক্রিয়া

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি নন, একজন বিশিষ্ট ভাবুক ও দার্শনিক হিসেবেই বেশি পরিচিতি পান। তাঁর কবিতার শিল্পমূল্য ও রস বিচার করার শক্তি অন্য ভাষাভাষী মানুষের বিশেষ থাকার কথা নয়, কিন্তু তাঁর কবিতার ভাব ও তাঁর কথার মূল্য ছিল অনেকের কাছে। নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পর তিনি ভারতের একজন মুখপাত্রেও পরিণত হন; তা না-ও যদি হন, অন্তত তিনি যে উপমহাদেশের একজন প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তাবিদ, তাতে অন্য দেশের মানুষের সন্দেহ ছিল না। ১৯১৬ সালের জুনে তিনি যখন জাপান সফর করেন তখন তাঁকে একজন দার্শনিকের মর্যাদাই দেওয়া হয়। বিদেশিরা তাঁর কথা শুনতে চেয়েছেন তাঁকে ভারতবর্ষের একজন ভাবুক ও মুখপাত্র হিসেবে। এবং তিনিও স্বেচ্ছায় সে দায়িত্বই পালন করতে চেষ্টা করেছেন।

১৯১৬ সালে ২৯ মে তিনি এক জাপানি কোম্পানির জাহাজে জাপানের কোবে বন্দরে পৌছান। সমুদ্রবন্দরে বেশ কিছু ভারতীয় বাঙালি ও অবাঙালি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর পূর্বপরিচিত কয়েকজন বিদ্বান জাপানিও ছিলেন। সরকারি কোনো ব্যবস্থা ছিল না, থাকার কথাও নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ মোরারজি নামক একজন গুজরাতি ব্যবসায়ীর বাড়িতে ওঠেন। কোবে বন্দরে তিনি এক সপ্তাহ ছিলেন।

সৌন্দর্যবাদী কবি জাপানে গিয়ে প্রথমেই সে দেশের বস্তুবাদী রূপটি দেখে কষ্ট পান। জাপানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করলেও সামাজিক রূপটি তাঁকে ব্যথিত ও শঙ্কিত করে। আধুনিক জাপান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি মৃদু সমালোচকের। তিনি তাঁর সফরনামা *জাপানযাত্রী*তে লিখেছেন :

...জাপান শহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজসজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশ বিদায় নিচ্ছে। আমার এই জানলায় বসে কোবে শহরের দিকে তাকিয়ে যা দেখেছি এ তো লোহার জাপান, এ তো রক্তমাংসের নয়।...চীনেরা যে রকম বিকট মূর্তি ড্র্যাগন আঁকে—সেই রকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটাকে খেয়ে ফেলেছে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারই পিঠের আঁশের মতো রৌদ্রে ঝকঝক করছে।...

এই দরকার নামে পদার্থটা যে মানুষের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে, বর্তমানের এই অর্থহীন অর্থের পেছনে ছোটা যে মানুষে মানুষে ঘৃণার পাঁচিল তুলে ধরছে তা বার বার এই কোবেতে বসে মনে পড়ছে। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে মানুষের প্রকৃতির বদল হয়ে আসছে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আসছে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

মানুষের এই যে অতিমাত্রায় বস্তুবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়া, এটা জাপান ইউরোপ থেকে শিখেছে বলে এশিয়াবাসী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের দুঃখ হয়। জাতি হিসেবে জাপানিদের ওপর ইউরোপের প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এশিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারছে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েছে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিটত না এবং বর্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

জাপানে সফরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমরবাদী-উপনিবেশবাদী নীতির নিন্দা করে নিৎশের প্রসঙ্গ ও জার্মানির প্রসঙ্গ তুলেছেন। এই বিষয়টি খুবই তাৎপর্যের। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনও যে রবীন্দ্রনাথের একটি পঠিত বিষয় ছিল, তা তার নিৎশে প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়। তিনি যখন নিৎশের কথা বলছেন, তখনো হিটলারের উত্থান ঘটেনি এবং ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা ক্ষমতায় যাননি। নিৎশের দর্শনের মূল কথা, মানুষের প্রধান আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা হলো ক্ষমতার স্পৃহা—'the will to power'।

আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্টই ধারণা ছিল। জার্মান দার্শনিকদের মধ্যে ফ্রেডরিক নিৎশের (যাকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন নীট্‌ঝে, জার্মানিকে লিখেছেন 'জর্মনি) দর্শন যে সমরবাদী তা তিনি

জানতেন। নিৎশে ৪৬ বছর বয়সে ১৯০০ অব্দে মারা যান। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক। তিনি যখন জাপান যান তখন নিৎশে বিশ্ববিখ্যাত নন। তবে পৃথিবীর শিক্ষিতসমাজে তাঁর নাম অজানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরিবারেও নয়। তিনি যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষ তাতে সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে খুব ভালোই অবগত ছিলেন। জাপান ইউরোপ থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও উপনিবেশবাদী নীতি দুটোকেই নিয়েছিল, তা তাঁর অজানা ছিল না। তাই তিনি বলেছেন, জাপানের 'মন্দিরে সব চেয়ে বড় দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ'। অর্থাৎ দেশের স্বার্থের জন্য পরদেশ দখলেও তার দ্বিধা নেই। সে জন্য জাপান হয়ে উঠেছে 'শক্তি-উপাসক'। এই দীক্ষা সে গ্রহণ করেছে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিম ইউরোপের কাছ থেকে। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে চমৎকার এক তথ্য জানিয়ে লিখেছেন :

> জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্যন্ত জাপান ভালো করে স্থির করতেই পারলে না—কোনো ধর্মে তার প্রয়োজন আছে কি না এবং সে ধর্মটা কী। কিছুদিন এমনও তার সংকল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করবে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে ধর্মকে আশ্রয় করেছে সেই ধর্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েছে, অতএব খৃষ্টানিকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে।
>
> [*জাপানযাত্রী*]

রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও একপেশে। এ সম্পর্কে আমি জাপানি রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ কাজুও আজুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জানান, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কোনো একাডেমিক দর্শনবিদের কাছে নিৎশের প্রসঙ্গ শুনে থাকবেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে নিৎশের দর্শনের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না। বিশেষ করে, জার্মানিতে জনপ্রিয় হওয়ার আগেই জাপানে তা জনপ্রিয় হতে পারে না। তা ছাড়া প্রচলিত বৌদ্ধ ও শিনতো মতবাদ বর্জন করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের কথা জাপানের মানুষ কখনো চিন্তা করেছে বলে মনে করার কারণ নেই। এখনো জাপানের এক শতাংশ মানুষও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী নয়। পশ্চিমের সঙ্গে জাপানের আত্মীয়তা সমরনৈতিক ও অর্থনৈতিক—সাংস্কৃতিক নয়, ধর্মীয় তো নয়ই। জাপানের সমরবাদিতাকে অতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাপানের জাতীয় জীবনে পশ্চিমি প্রভাবের কথা একটু বেশি বলেছেন। আজুমাকে আমি বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যদি বাড়িয়ে বলেও থাকেন, খুব ভুল করেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের ভূমিকাই তাঁর প্রমাণ।

ইউরোপে যখন উনিশ শতকে পুঁজিবাদ ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করেছিল, তখন ফ্যাসিবাদী শাসকেরা নিৎশের দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট এবং সমাজে শোষিত ও শোষকের দ্বন্দ্বের ফলে সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার যে বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে ধ্বংস করতে অর্থাৎ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করতে নিৎশের প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের উদার গণতন্ত্র ও মানবতাবাদী দর্শনকে 'দুর্বলতা' বলেছেন নিৎশে। অনাগত সামাজিক বিপ্লবকে রোধ করতে হলে ক্ষমতাবানদের দুর্বিনীত, কঠিন ও দুঃসাহসী হতে হবে, এমনকি নিষ্ঠুর পর্যন্ত হতে হবে। গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ দিয়ে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না—সমাজকে রক্ষা করতে পারবে সেই Superman বা 'অতিমানুষ' যিনি দুর্বল ও উদার গণতন্ত্র ও মানবতাবাদকে প্রশ্রয় দেবেন না। নিৎশের দর্শনের বিপদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অতি সচেতন ছিলেন। সে কথা জাপানে গিয়ে বলেছেন এবং তা বলেছেন হিটলারের আবির্ভাবের দেড় দশক আগে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার দুই দশকেরও বেশি আগে। জাপানি বুদ্ধিজীবী ও নীতিনির্ধারকদের কাছে তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং তাঁরা তা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

জাপানে যাত্রা করার অব্যবহিত আগে তিনি লিখেছেন *ঘরে-বাইরে*। এর মূল দর্শন হলো বাস্তবতা ও আদর্শবাদের সংঘাত। জাতীয়তাবোধ বা nationalism অনেক দেশপ্রেমিকের কাছেই সত্য, কিন্তু আদর্শবাদীর কাছে মানবধর্মই সত্য ধর্ম। সেদিনের ভারতবর্ষের তরুণ মনে দেখা দিয়েছিল দ্বন্দ্ব। কোন আদর্শ তারা গ্রহণ করবেন: প্রাচীন ভারত নাকি আধুনিক ইউরোপ। প্রাচীন ভারতকে তাঁরা আদর্শ মনে করেন ধর্মীয় সংস্কার ও ভয় থেকে, আধুনিক ইউরোপকে আদর্শ করতে চান বৈষয়িক মোহ থেকে। ফলে তারা কোনোটাই ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারেন না—প্রাচীন ভারতের মহান আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ হন, ইউরোপের জ্ঞান ও সাহসও আয়ত্ত করতে পারেন না। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে ভেবেছেন—বলেছেন এবং লিখেছেন।

জাপানে তিন মাস অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় সংবর্ধনা পান এবং অনেক জায়গায় বক্তৃতা দেন। যার বিষয়বস্তুতে শিল্প-সাহিত্য অল্প—দার্শনিক চিন্তা, বিশ্বরাজনীতির অমঙ্গলের দিকে হুঁশিয়ারি বেশি। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল। জাপানের রণহুঙ্কার ও পরদেশে সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা লক্ষ করে তিনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন। এবং ক্ষুব্ধ চিত্তে লেখেন The spirit of Japan এবং The Nation শীর্ষক বক্তৃতাগুলো।

জাপান থেকে আমেরিকায় রওনা হওয়ার আগে তিনি অবগত হন যে

সেখানেও 'চল্লিশটি বক্তৃতা' দিতে হবে। তবে চল্লিশটি আলাদা বক্তৃতা নয়। জাপানে যা লিখেছেন এবং বলেছেন, সেগুলোরই 'একটা-না-একটা শহরে শহরে বারবার আউড়ে যেতে হবে। The Nation বলে যেটা লিখছি সেইটেই সবচেয়ে বেশি বার পড়ব—' এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। উগ্র জাতীয়তাবাদের বাড়াবাড়িতে তিনি বিপন্ন বোধ করেছিলেন।

উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও উপদেশমূলক কথা জাপানি শাসক ও বুদ্ধিজীবীদের বিরক্তির কারণ ঘটায়। খুব অল্প মানুষের কাছে, বিশেষ করে যুবসমাজের কারও কারও তাঁর আদর্শবাদী কথা কিছুটা ভালো লেগেছিল। তবু জাপানে পৌঁছে যেটুকু আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, জাহাজঘাটে যতটা লোকজন ছিল, বিদায়ের দিন তার সিকিভাগও ছিল না।

জাপানি কবি ওন নোগোচি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের শ্রোতাদের একদল তাঁকে মনে করেছেন নিছক নেতিবাচক স্বমত প্রচারকারী অথবা একজন খেয়ালি স্বাপ্নিক—merely a propagandist of negativism or willful dreamer। আরেক দল মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত করেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জাতির আত্মিক উন্নতির জন্য—encouraging the individualism to assert the inner development of the nation. The Japanese chauvinists (I admit that we have a great member of them here) were pleased to hear the Indian poet saying that the political civilization which had sprang from the soil of Europe and was over-running the whole world like some polific weed, was based upon exclusiveness; জাপানিদের প্রশ্ন : কী করে আমরা সঠিকভাবে পাশ্চাত্য আগ্রাসন রোধ করব? How can we properly check the Western invasion?

[*Modern Review*, November 1916, Pp 529-30]

এ প্রশ্নের জবাব রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল, কিন্তু তা শোনার মানুষ ছিলেন না সেদিন জাপানে।

এই পর্যায়ে আরও কিছু জাপানি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বুদ্ধিজীবীর কিছু মতামত আমরা তুলে দেব, তাতে জাপানে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কতটা মূল্য পেয়েছিল এবং তাঁর অবস্থানটি কেমন হয়েছিল তা পরিষ্কার হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মানেই যুদ্ধবাজ। জাপান ছিল তখন এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি। তার সমরশক্তি তখন ছিল প্রাচ্যের যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। শুধু নিজের শক্তি নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল না। অন্য ভূখণ্ডে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। গোটা জনগণকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। যুদ্ধজয়ের গৌরবগাথা শিশুপাঠ্য

বইপত্রে থাকছে। ইউরোপে যুদ্ধ চলছে। এদিকে এশিয়ায় ক্ষমতার দাপটে জাপান উন্মত্ত প্রায়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য মরণপণ চেষ্টা করছে, গড়ে তুলছে কলকারখানা। রবীন্দ্রনাথ *জাপানযাত্রী*তে লিখেছেন :

> চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলোকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব।

জাপানে ভোগবাদী সভ্যতার অপ্রতিহত গতি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়েছিলেন। পণ্যের বিজ্ঞাপনে মিথ্যার বাক্‌চাতুর্য দেখে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—প্রতারণাই কি আধুনিকতা? তিনি বলেছিলেন, ইউরোপ আমাদের সে শিক্ষাই দিচ্ছে। অথচ ইউরোপে তো মহৎ জিনিসেরও অভাব নেই। সেসব থেকে কেন আমরা শিক্ষা নিচ্ছি না। ইউরোপই তো ব্যক্তি-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতার কথা পৃথিবীকে শুনিয়েছে। বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় তাঁদের সাফল্য সীমাহীন। জাপানের বিদ্বানদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন অন্ধ patriotism ও উন্মত্ত nationalism এবং national selfishness কোনো জাতিকে মহান করে না। সমরবাদী নীতি মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁর অনুসারী 'জাপানের বের্গসঁ' বলে খ্যাত নাকাজাওয়া আইনসেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিরোধী বক্তব্যকে আধুনিক ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন। বের্গসঁর একজন জাপানি অনুবাদক হিরোশি তেৎসুজি লিখিছিলেন :

> শিক্ষিত জাপানিদেরকে পশ্চিমি সভ্যতার জয়গানে মুখরিত হওয়ার স্বপ্নময় জগৎ থেকে সরিয়ে এনে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগ্রত করার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এবং সে কারণেই আমি মনে করি আমাদের সমগ্র জাতি ঠাকুরের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

অপরদিকে আর এক দর্শনবিশারদ তানাকা ওদো হতাশ হয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন :

> আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করছি (রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির অনুবাদের) প্রতিটি বিজ্ঞাপনেই বলছে আগামী দিন নাকি ঠাকুরের যুগ বলে পরিগণিত হবে।

ইয়ারোজু চোচো (আন্তর্জাতিক সংবাদ) নামের দৈনিক পত্রিকার প্রকাশক-সম্পাদক কুরোইওয়া শুরোকু রবীন্দ্রনাথের কথাকে কোনো মূল্য দেননি। তাঁর মতামত দিতে গিয়ে এক নিবন্ধে লিখেছেন :

> ঠাকুরের চিন্তাধারা নৈরাশ্যবাদের দর্শন। জাপানের পক্ষে সে দর্শন মোটেই উপযোগী নয়; তাই তাঁর এই জাপান সফরে আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই। কিন্তু

সময়ে সময়ে আমাদেরও তো কিছু বিনোদন দরকার—অনেকটা ক্লান্তি দূর করতে ঠান্ডা পানীয়ের মতো!

চরম দক্ষিণপন্থী সাংবাদিক মিৎসুই কোশি রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, তা এক বাস্তববিমুখ পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কারণ, ভারতবর্ষ বিদেশিদের দ্বারা শাসিত আর জাপান বিদেশিদের শাসন করে। যখন আর্যরা ছিল বিজয়ী শুধু তখনই, সেই প্রাচীন ভারতবর্ষেই চিন্তার প্রাণপ্রাচুর্য ছিল। তাই, তিনি মনে করেন, 'আমি মনে করি, তার কাছ থেকে আমাদের শেখার কিছু নেই, বরং তাঁকেই আমাদের কাছে অনেককিছু শিখতে হবে।'

সেকালের জাপানের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, যিনি জাপানি হাইকু কবিতা ও চীনা কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন, ইংরেজি ভাষায়ও ছিলেন পণ্ডিত, সেই নাৎসুমে সোসেকি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা বিষয়ে মন্তব্য করতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। খুবই খরব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে পরিচিত নাৎসুমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখাও হয়নি। তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমি তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না।' এক বিখ্যাত জাপানি নাট্যকার আকিতা উজাকু লিখেছিলেন, 'স্যান্‌জ ন তাগোরু' অর্থাৎ 'ঠাকুরের সঙ্গে পর্বতশীর্ষে' শীর্ষক এক প্রবন্ধ। তাতে তিনি লিখলেন, 'আমাকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় কবির বেশির ভাগ চিন্তাধারার সঙ্গে আমি একমত নই। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধ আছে, যেমন আছে তাঁর দর্শনচিন্তার মূল সুরটির সঙ্গে—এক নবীন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দর্শন চিন্তা—যেমন, বস্তুজগৎ ও মনোজগতের সমন্বয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা, মহাবিশ্বের নিয়মাবলি প্রসঙ্গে তাঁর অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্তমান সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর বিচার কিংবা মানবসমাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত—এ সবই আমার কাছে খুবই অর্থবহ বলে মনে হয়।'

জাপানি ভাষায় রবীন্দ্রজীবনীর লেখক ইয়োশিদা গেনজিরো কবিতার ভাষায় বাঙালি কবির প্রশংসা করে লিখেছিলেন : 'তিনি কপোতের মতো শান্ত, সেন্ট পলের মতো দৃঢ় এবং কখনো-বা মনে হয় তিনি এক মহান বীর।'

ফরাসি সাহিত্যে পণ্ডিত, সুলেখক, ভিক্টর হুগো এবং রঁমা রলাঁর অনুবাদক ইয়োশিদা রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর সম্মান জানিয়ে লিখেছিলেন, 'প্রাচীনকাল থেকে আমাদের হৃদয়ে যে ঐতিহ্যগত সহজ, সরল মানবিক অনুভূতি প্রবাহিত তার প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।' কিন্তু তিনিও জাপানের প্রতি কবির শান্তির আহ্বানে খুশি হননি। তিনি বলেন, 'তিনি আমাদের কোনো ভবিষ্যতের পথনির্দেশ দিতে পারলেন না, ...তাঁর জগতে পৌঁছতে গেলে আমাদের যে অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হবে! দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বলতে

হচ্ছে, ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করতে গেলে যে শক্ত পাথরগুলো দিয়ে আমাদের ভিত্তি গঠিত হবে, সত্যি বলতে কি, ভারতীয় কবি সেগুলোই আমাদের ত্যাগ করতে বলেছেন। আমার তরুণ হৃদয় তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাঁকে সমর্থন করে না।'

ফরাসি সাহিত্যের আর এক বিশেষজ্ঞ-লেখক, নাইতো আরও মন্তব্য করেছিলেন, 'যারা বিশ্বাস করেন, কাব্য ও শব্দের মধ্যে আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির বীজ নিহিত তাদের কথা আমার বোধগম্য নয়।' সমাজবাদী লেখক ওগাওয়া মাইমেইর মন্তব্য, 'ধনী পরিবারে জন্মেছেন বলেই রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে ও অবলীলাক্রমে নিসর্গের সঙ্গে যোগাযোগে পটু।' অপর এক লেখক কাতো কাজুও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'হতে পারেন রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে শ্রদ্ধেয়, এমনকি তিনি পতিতা-গমনে অনভ্যস্ত...কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা আমার মতো মানুষের কাছে একঘেঁয়ে বলে মনে হয়।'

সে সময় হাইকু কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন কাওয়া-হিগাসি হেকিগতো। তিনি বিখ্যাত *নিপ্পন অয়োবি নিপ্পনজিন* (জাপান ও জাপানি) কাগজে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেন, 'ঠাকুরের দার্শনিক চিন্তায় গভীরতার অভাব আছে, যা আছে তা সহজবোধ্য নয়।' তাঁর মতে, 'ভারতীয় বলেই রবীন্দ্রনাথ বর্তমানকে এড়িয়ে যেতে চান। নিজের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে দায়বদ্ধতার যে যন্ত্রণা তাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন এবং সেজন্য পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়াইয়েও তিনি অক্ষম।'

সবচেয়ে কঠোর ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার ইয়ানো হোমেই। তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, আবেগপ্রবণ এমনকি প্রায়-অতীন্দ্রিয়বাদী অধঃপতিত (decadent) সাহিত্যের প্রতিনিধি বলে। 'ধ্বংসাবশিষ্ট ভারতবর্ষ থেকে ফসিল-প্রায় সব চিন্তাধারা নিয়ে স্বাধীন এবং উন্নত এক দেশ জাপানে এসে বস্তুবাদী সভ্যতাকে অস্বীকার করার মতো অবাস্তব চিন্তা আর কিছু নেই। অধিকন্তু সৈন্যদল ও নৌবহর, রেলপথ ও অর্ণবপোতসমূহ, যা বস্তুবাদী সভ্যতার নিদর্শন, তা যে আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অর্থাৎ প্রাচীন জিগীষু জাপানেরও প্রতিনিধি তা বোঝার অন্তর্দৃষ্টি তাঁর আছে বলে মনে হয় না। ...যা হোক, তাঁর বক্তব্যকে কথার কথা বলেই আমাদের ধরতে হবে। কিন্তু তাঁর কবিতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে ব্যবহার করতে হয় সেই 'অকেজো' শব্দটা, যা তিনি এই ম্যাটেরিয়ালিস্ট সভ্যতা সম্বন্ধে ব্যবহার করেন।'

জাপানের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দর্শন সমর্থন ও সমাদর পায়নি। তাঁর দর্শন সেখানে অনেকের বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। কিন্তু সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ বা অন্যদের তুলনায় জাপানের ধর্মীয়

নেতারা রবীন্দ্রনাথকে অনেক বেশি সম্মান জানিয়েছিলেন। 'জেন'মতাবলম্বীদের নেতা কুরুমা তাকুদো মন্তব্য করেছিলেন, 'যেভাবে জাপানে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো তাতে বোঝা যায় আজও আমাদের মধ্য থেকে আধ্যাত্মিক সভ্যতার দীপ নিভে যায়নি। ...আমি বিশ্বাস করি পাশ্চাত্যের অন্ধভক্তির স্বপ্ন থেকে তিনি জাপানিদের অন্তত কিছু পরিমাণে হলেও মুক্ত করতে পেরেছেন।'

শিনশুন সম্প্রদায়ের নেতা শিমাজি দাইতো, যিনি ১৯০২-৩ সালে ভারত সফর করেন, লিখেছিলেন, 'অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও যে ভারতীয় সুবাতাস আমাদের দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, তাতে আমি আনন্দিত।'

রবীন্দ্রনাথের পোশাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক অবয়বে মুগ্ধ আরেক ভারত পরিব্রাজক তাকেদো তায়োশিরো লিখেছিলেন, 'যেন কবেকার এক পুরনো বন্ধুকে আমরা স্বাগত জানালাম। যেমন আশা করেছিলাম তেমনি ঋষিতুল্য তাঁর মুখচ্ছবি।'

জাদো সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ওয়াতানাবে কাইকিওকু একটু বাড়িয়েই লেখেন, 'আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে, মিস্টার ঠাকুরের এই সফর আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে ঐক্য ও সহনশীলতার মানসিকতাজাত আচরণ এনে দিয়েছে।'

শিনশুন সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সংস্কারক ইতোশোগিন ছিলেন তলস্তয়ের ভাবশিষ্য। তিনি প্রশংসা করে লেখেন, 'ঠাকুরের চমৎকার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। এর জোরেই তিনি জাপানে নবীন ও প্রাচীন বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিল্পী, রাজনীতিক প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে একত্র করতে পেরেছেন।'

সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক বিকুগো জাসশি। জাতীয়তাবাদী খ্রিষ্টান নেতা এবিনা দান্‌জ লেখেন, পাশব প্রবৃত্তি সর্বত্রই বিরাজমান। তাই পূর্ব-পশ্চিম বলে সভ্যতাকে ভাগ করা যায় না, ভাগ করা যায় নবীন ও প্রাচীন বলে। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ধারার প্রবক্তা।

সেকালে জাপানের যাঁরা দার্শনিক বলে পরিচিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সফরে ও বক্তৃতাতে তাঁদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দার্শনিক আবেজিরো জাপানকে চিন্তাজগতে নতুন কিছু দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথের তারিফ করেন। ওয়াৎসুজি তেৎসেও বলেন, 'বহু বিষয়ে আমি ভারতের কবির সঙ্গে একমত।...তাঁর রচনাগুলো আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ এবং গভীর।' কান্টপন্থী দার্শনিক কানেকো উমাজি ঋষি ঠাকুর বা 'শেই তাগোরু' নামে এক সংকলন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জাপান সফর বিষয়ে দুই প্রতিপক্ষের মতামতের

কথা লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, 'একদিকে একদল মানুষ তাঁর দর্শনকে না বুঝেই, তিনি যেন কোনো সন্ত বা প্রবুদ্ধ মানুষ, এই ভেবে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অপরদিকে আরেক দল মনে করে তিনি নতুন কিছু মোটেই বলছেন না, যা বলছেন তা উপনিষদেরই শাশ্বত বাণী; সুতরাং তাঁর কাছ থেকে শিখবার কিছুই নেই।' কানেকো নিজে ছিলেন দ্বিতীয় মতের একজন। তবে তিনি স্বীকার করেন, 'অবশ্য তিনি একজন অসাধারণ কবি।'

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ইনোউয়ে তেৎসুজিরো লিখেছিলেন, 'একটি বিধ্বস্ত দেশের দুঃখের সংগীতের মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। ঠাকুর সভ্যতার স্রোতকে বিপরীত দিকে চালিত করতে চান। আমি চাই না তাঁর মতামত প্রচারিত হোক।' 'তাগোরু ন কোয়েন নিৎসুইতে' শীর্ষক এক লেখায় *রিকুগো জাস্‌শি* পত্রিকায় জুলাই, ১৯১৬-তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি আরও বললেন, 'মানবসভ্যতা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন, কিন্তু বিজ্ঞান নিজেই লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। সুতরাং ঠাকুর মহাশয় যে মানবতাবাদের প্রতি অত্যন্ত জোর দিচ্ছেন আমি তার সঙ্গে একমত।'

কট্টর জাতীয়তাবাদী দার্শনিক কিহিরা মাসাইয়োশি রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন; কারণ, ভারতীয় কবির মতামত উদীয়মান জাপানের আদর্শের পরিপন্থী। অপরদিকে উদারপন্থী দার্শনিক ইয়োশিনো সাকুজো সম্পূর্ণ অন্য কারণে তাঁকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, '(তাঁর বক্তৃতা শুনে) মনে হচ্ছিল যেন কোনো মধুর সংগীত শুনছি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তুতে প্রশংসার যোগ্য কিছুই নেই।' কারণ তাঁরা অর্থাৎ উদারপন্থীরা পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন, এমনকি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরও তাঁরা বিরোধী।

ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানাকা ওদো, অনেক দিন আমেরিকায় শিক্ষকতা করেছেন এবং চিন্তার দিক থেকে ছিলেন দার্শনিক জন ডিউইয়ের ভাবশিষ্য। *চুয়ো কোরণ* নামের পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে লিখেছিলেন, 'আপনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভুল বুঝেছেন। আপনি প্রেমের জয়গান গেয়েছেন, কিন্তু এই আদর্শকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু বা কোনো হাতিয়ার আছে কি? ...যখন আমি বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা এবং ধর্ম ও কলাভিত্তিক সভ্যতার তুলনা করি, তখন তো আমার মনে হয় দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

আর এক পত্রিকা *শিন কোরন*-এ (অক্টোবর, ১৯১৬) 'তাগোরু ওয়া শিজিন ন মি ইন্দোজিন' 'কবি হিসেবে ও ভারতীয় হিসেবে ঠাকুর' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে

তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখেছেন। আবার যখন বর্তমান নিয়ে আলোচনা করতে গেছেন, তখন উপযুক্ত কারণ না দেখিয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবকে ভয়ংকর বলেছেন।' তিনি আরও লিখলেন, 'ঠাকুর এক বিধ্বস্ত জাতির প্রতিনিধি। তার কাছ থেকে কিছু শেখার পরিবর্তে, এক আধুনিক, সভ্য, প্রগতিশীল জাতির প্রতিনিধি হিসেবে জাপানি বুদ্ধিজীবীরা তাঁকেই বরং অনেক কিছু শেখাতে পারেন। ...এ কথা এখন প্রশ্নাতীত যে, আজ ঠাকুর আমাদের যা দিয়েছেন বা দিতে পারেন সেসব আমরা বাজে আবর্জনা গণ্য করে আধুনিক জীবনে প্রবেশের বহু আগেই পরিত্যাগ করেছি।'

পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে টোকিওর প্রভাবশালী *আশাহি শিমবুন* রবীন্দ্রনাথকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। প্রথম দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার পর ওই পত্রিকা মন্তব্য করে, 'রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মহান ও সুউচ্চ'! আবার দ্বিতীয় দিনের পর লিখল, 'স্পিরিট অব জাপান' বক্তৃতাটি প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। বক্তব্য আগের দিনের মতোই। তিনি আবারও বর্তমান সভ্যতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। পত্রিকাটি মন্তব্য করে, ভারতীয় কবির এই কবিত্বপূর্ণ বক্তৃতাগুলোর মর্মার্থ অস্পষ্ট, বেশির ভাগ মানুষেরই বোধগম্য হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যুক্তিবিবর্জিত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু অনেক সময়ই তাঁর মতামতের প্রকাশভঙ্গি ছিল কবিসুলভ। ভাষা অতিরিক্ত অলংকার ও উপমাবহুল। মননশীল মানুষ সাধারণত তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য-প্রমাণ দাখিল করেন, তিনি তা করতেন না। সে জন্য বিদেশে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। *ইয়রজু চোহো* পত্রিকা এক সম্পাদকীয়তে লিখেছিল :

> প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতা দুটির মহামিলনই জাপানের ব্রত, কিন্তু ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে ভাববাদী সভ্যতার যদি বস্তুবাদী ভিত্তি না থাকে তবে সে দেশের ধ্বংস অনিবার্য—কবি রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো মণিরত্নের মত, তাঁর বাক্যগুলি আকাশের নক্ষত্রের মত জাজ্বল্যমান, কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কোনো তথ্য বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তাঁর সবই কাব্যময়, এবং তাঁর কবিতার জন্য তাঁকে আমরা প্রশংসা না করে পারি না। কিন্তু তাই বলে তাঁর কথামতো বিজ্ঞানচর্চা ও সম্পদের অনুসন্ধানে আমাদের যাত্রা বন্ধ করা চলে না।

প্রশংসা-সমালোচনা যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা সামগ্রিকভাবে জাপানের শিক্ষিতসমাজে কোনো আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারেনি। এমনও হতে পারে যে তাঁর কথার তাৎপর্য বৈষয়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাপানিরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেননি। জাপান পৌঁছার আগে তাঁর সফর নিয়ে জাপানিদের মধ্যে যে ঔৎসুক্য ছিল, তাঁর বক্তব্য শোনার পর তাঁর প্রতি জাপানিরা আগ্রহ হারান এবং অনেকেই হতাশ হন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ নিজেও

হতাশ হয়েছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদী পত্রিকা *নিপ্পন অয়রি নিপ্পনজিন* কিঞ্চিৎ কঠোর ভাষায়ই মন্তব্য করে :

> সত্য বলতে কি, ভারতীয় কবির তিন মাস জাপান বাসকালে তাঁর দার্শনিক চিন্তা এবং তার প্রভাব জাপানের জীবনে—দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয়—অতি সামান্য। এটা আমাদের দেশবাসী বা কবি সবার পক্ষেই হতাশাব্যঞ্জক।

প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের—ভারত, চীন ও জাপানের—সভ্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ গর্ববোধ করতেন। আজ ইউরোপ ও পশ্চিম এগিয়ে গেছে, কিন্তু একদিন এশিয়াই এগিয়ে ছিল—সে কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার উচ্চারণ করেছেন। আধুনিককালে জাপানের তথা প্রচ্যের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

> দীর্ঘকাল যে অপবাদ এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হতো, তাকে মিথ্যা প্রমাণ করে জাপানের এই জাগরণ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে শুধু বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়ই নয়, দর্শন, বিজ্ঞান ও নানা কলাবিদ্যায় একদিন এই এশিয়াই পৃথিবীর পথপ্রদর্শক ছিল। 'For centuries we did hold torches of civilisation in the East when the West slumbered in darkness; and that could never be the sign of sluggish minds of narrowness of vision'. এরপর চলেছিল দীর্ঘ ঘুমের পালা। এশিয়া যে বেঁচে আছে তারই প্রমাণ দেওয়া তখন দুষ্কর। এরই মাঝে হঠাৎ এক শুভ সকালে গভীর ঝনঝনিতে চমকে উঠে সবাই অবাক দৃষ্টিতে দেখল জাপান তার পুরোনো অভ্যাস থেকে জেগে উঠেছে—'One morning the whole world looked up in surprise when Japan broke through her walls of old habits in a night and came out triumphant...She showed the confident strength of maturity, and the freshness and infinite potentiality of new life at the same moment'.

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্য হলো, জাপান একই সঙ্গে পুরোনো ও নতুন—'The truth is that Japan is old and new at the same time.' জাপানের অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র জাপানই পশ্চিম থেকে আহরিত জ্ঞান নিজেদের প্রয়োজনমতো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেই জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা সে অর্জন করেছে। সে জন্য জাপানের দায়িত্ব বিরাট। এশিয়ায় জাপানের ভূমিকা থেকে ইউরোপ তাঁর প্রশ্নের জবাব পাবে। জাপানে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে তা থেকে আধুনিক সভ্যতার অনেক উপাদান সৃষ্টি হবে, সঞ্চারিত হবে প্রাণ। তাঁর ভাষায় :

> Of all countries in Asia, here in Japan you have the freedom to use the materials you have gathered from the West according to

your genius and your need. Therefore your responsibility is all the greater, for in your role Asia shall answer the questions that Europe has submitted to the Conference of Man. In your land the experiments will be carried on by which the East will change the aspects of modern civilisation, infusing life in it where it is a machine, substituting the human heart for cold expediency, not caring so much for power and success as for harmonious and living growth for truth and beauty.

জাপানে দেওয়া বক্তৃতাগুলো রবীন্দ্রনাথের *Personality* (১৯৯৭) এবং *Nationalism* (১৯১৭) বইতে প্রকাশিত হয়। এসব বক্তৃতায় ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির চিরকালের যে সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব তাই তিনি আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সবটা আধুনিক পণ্ডিতের মতো নয়, প্রাচীন ঋষিদের উপদেশের মতো, কিন্তু মর্মবাণী বাস্তববাদী মানুষের উপলব্ধির মতোই।

যে সব জাপানি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেছিলেন তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম ছিলেন না, তাঁদের পাণ্ডিত্যে ঘাটতি ছিল না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সেদিন জাপানের বস্তুবাদিতা ও সাম্রাজ্যবাদী বাড়াবাড়ির অশুভ পরিণাম দেখতে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করার আগেই রবীন্দ্রনাথ মারা যান। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যেদিন মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ পারমাণবিক বিপর্যয় হলো, তাঁর ঠিক চার বছর আগে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যারা সমালোচনা করেছিলেন, তাঁকে বিদ্রূপ করেছিলেন, তাঁর বাণীকে অর্থহীন ভাবালুতা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁদের সেদিনের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

১৯১২ সালের ইউরোপ-আমেরিকা সফর কিছুটা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ছিল। বিশেষ করে ইংরেজ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এবং ইংরেজি গীতাঞ্জলির সপ্রশংস মূল্যায়ন তাঁদের থেকে আদায় করতে পারা তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। ওই সফরটিতে শুধু তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হন তাই নয়—বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি ও ভারতবর্ষের মানুষও লাভবান হয়। যোগ্যতার বিচারে তিনি হয়ত নোবেল পুরস্কার একদিন পেতেন, কিন্তু ১৯১২-র সফর তা এগিয়ে নিয়ে আসে। পুরস্কার পাবার পর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বলেখকসমাজের একজন স্বীকৃত সদস্য হন এবং পরিণত হন ভারতবর্ষের ভাবুকদের একজন মুখপাত্রে।

ইউরোপের মতো আমেরিকায়ও 'একটি বিরোধী মত' রবীন্দ্রনাথকে 'আক্রমণ' করেছে। তাঁর 'মতামতের' বিরুদ্ধে 'কঠোর সমালোচনা' হয়েছে। কোনো চিন্তাবিদের মতামতের সঙ্গে ভিন্নমত কেউ পোষণ করতেই পারেন, তাঁর চিন্তাধারার সমালোচনা হতেই পারে, কিন্তু আমেরিকার পত্রপত্রিকার সমালোচনার ধরন ও ভাষা তাদের অদূরদর্শিতা, দম্ভ ও দীনতারই প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের দর্শনকেই তাঁরা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করেছেন।

তিন মাস অবস্থানকালে জাপানে ন্যাশনালিজমের বা উগ্র জাতীয়তাবাদের রুদ্রমূর্তি দেখে তিনি Nationalism-এর ভাষণগুলো লিখেছিলেন। উগ্র ন্যাশনালিজমকে আক্রমণ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঠিক মানবতাবাদী চিন্তার ফসল। জাতীয়তাবাদকে তিনি 'অপদেবতা' আখ্যা দিয়েছিলেন। যুদ্ধবাজরা তাঁর বক্তব্য অপছন্দ করলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁর কথায় জীবনের গভীর অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন এবং তাঁদের থেকে তিনি পান গভীর শ্রদ্ধা।

আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে ও নগরে তিনি বক্তৃতা দেন, বস্তুত প্রায় একই কথা সব জায়গায় শোনান। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি বা 'স্যার' খেতাব পাওয়ায় অনেকেরই ধারণা হয়, তিনি ইংরেজদের আস্থাভাজন ও অনুগত। এটাও সত্য যে ওই খেতাব অনুগতরা ছাড়া কেউ পান না। তিনি যেমন কট্টর ব্রিটিশবিরোধীও ছিলেন না, তেমনি তাদের অনুগতও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যিকারের স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, তবে তাঁর জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিশ্বমানবতাবাদ ও বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্বের কোনো বিরোধ নেই। তাঁর আমেরিকায় প্রদত্ত উগ্র জাতীয়তাবাদবিরোধী ন্যাশনালিজম বক্তৃতায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতীয় 'হিন্দুস্থান গদর' পার্টির ক্যালিফোর্নিয়ার এক উগ্রপন্থী বিপ্লবী নেতা—রামচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথের জীবননাশেরও পরিকল্পনা করেছিলেন বলে প্রচারিত হয়, যা পরে রামচন্দ্র অস্বীকার করেন।

সানফ্রানসিসকো কল (Sanfrancisco Call) রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ওপর মন্তব্য করেছিল :

> রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন ভারতের জন্য কী করেছে? আমাদের কী অবস্থা হতো যদি আমরা তাঁর এই তত্ত্ব জীবনে প্রয়োগ করতাম। ভারত আজ কুব্জ, অর্ধভুক্ত ও ছেঁড়া কাঁথা পরিহিত—বোধিবৃক্ষের তলে বসে আছে, আর অনন্তের চিন্তা করছে। আত্মসমর্পণ খুব বড় গুণ, তা সে খ্রিষ্টানদের মধ্যেই হোক আর পৌত্তলিকদের মধ্যেই হোক। ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ মন্ত্র প্রচার করুক—আমরা আমেরিকানরা দৃঢ় সংকল্পকে ভালো করে সাধন করি।

মতাদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বিদেশেও নানা রকম অপমান রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করতে হয়েছিল। সেবার তাঁর আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল অর্থ সংগ্রহও—নিজের জন্য নয়, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য। *লস অ্যাঞ্জেলেস এক্সপ্রেস* শ্লেষের সঙ্গে লেখে :

> তহবিল সংগ্রহ বা অর্থ রোজগার করার উদ্দেশ্যেও আমেরিকানদের প্রয়োজন আছে দেখছি। ঠাকুর-মহাশয় আমেরিকানদের তাদের ধনের জন্য সমালোচনা করছেন—কিন্তু সেখানে এসেছেন তাদের উপার্জিত অর্থের কিছু অংশ নিতে। ধন খুবই খারাপ জিনিস, ধনোপার্জনবৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত...কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছ ধন—যা তিনি এতই ঘৃণা করেন—তাই তাঁকে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পশ্চিমের আদান-প্রদানে বিশ্বাস করতেন, নিজের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, জাপান ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফেরার কিছুদিন পর রামমোহন লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের ও তাঁর চিন্তার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ দেন। তিনি বলেন :

> শিল্পরসিক জাপান হইতে তাহার সৌন্দর্যবোধ, তাহার rhythm বা ছন্দের সূক্ষ্ম উপলব্ধি প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে-সকল দৈন্য ও কুশ্রীতা আছে তাহাদিগকে কিরূপে সুষমাময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করা যায়, ইহা রবীন্দ্রনাথ নানা দিক্ হইতে এবারে দেখাইতে পারিবেন এইরূপ আশা করিতে পারি। কিরূপে জাপানের সেই সরল ও নিরলংকার সৌন্দর্যের ভাব আকাশ বাতাসের মতো আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত হইতে থাকিবে, তাহাও তিনি দেখাইবেন এই আশা করিয়া রহিলাম।

রবীন্দ্রনাথ জাপান, আমেরিকা বা অন্য দেশকে শুধু ভারতের বাণী শোনাতে যাননি, তিনি সেসব দেশ থেকে তাঁদের ভালো জিনিস কিছু নিয়েও আসেন। শীল আশা প্রকাশ করে বলেন :

> তার পর আমাদের এই বহুকালের প্রাচীন সমাজের নানাপ্রকার জীর্ণ অবস্থার মধ্যে একটা নবযৌবন নবপ্রাণের সঞ্চার কিভাবে হইতে পারে, নবীন আমেরিকা হইতে সেই বার্তা তিনি আনিয়াছেন। প্রাণের বেগে ক্রমাগতই সম্মুখের দিকে চলা—আমেরিকার কবি হুইট্‌ম্যান যে Forward March-এর গান গাহিয়াছেন—আমাদের এই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সেই নূতন জীবনের বিজয়যাত্রার আনন্দকে তিনি উদ্বোধিত করিয়া দিবেন, এইরূপ আশা করিতেছি।

আদর্শগত দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দুই বিপরীত মেরুর—একজন উদার মানবতাবাদী, আরেকজন কট্টর হিন্দুত্ববাদী।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবগাথা প্রচারে শীলের উৎসাহ ছিল অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন সমস্ত মানবজাতি নিয়ে। তবে ভারতের স্বার্থ সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন।

রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ ও শেষবার জাপান সফর করেন ১৯২৯-এর মার্চে। তিনি যাচ্ছিলেন ভ্যাঙ্কুভারে একটি বক্তৃতায় আমন্ত্রিত হয়ে, জাপানে যাত্রাবিরতি করেন। আগেরবারের মতো এবারও ধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক মাসাহারু আনেসাকি তাঁকে সঙ্গ দেন। এবার রবীন্দ্রনাথের সুর জাপান সম্পর্কে কিছুটা নরম। ভ্যাঙ্কুভারে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অবসরের দর্শন'। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে তিনি জাপানি সুধীদের বলেন :

> পশ্চিমীকরণের আধুনিক বস্তু-সভ্যতা মানুষকে করে অতিরিক্ত সক্রিয় ও ক্লান্ত, তাই মানুষের গভীর আত্মাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত করে মানুষের জীবনযাত্রা, বিশেষ করে শহরে সত্যই ভর্তি পাগলামিতে মাতলামিতে। সেই জন্যই আমাকে নিরিবিলি শান্তি চাইতে হবে। মাঝে মাঝে সামান্য হোক আরামে নিদ্রা যাওয়ার অবকাশ পাওয়া দরকার। সময়কে সম্পূর্ণ দখল করার জন্য অবসর দরকার—আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও এবং জীবনযাত্রার শান্তি পাওয়ার জন্যও প্রথম প্রয়োজন অবসর। এটাই প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মের মর্মকথা। আমি বিশ্বাস করি জাপানিরা সহজে আমার এই কথা কান পেতে শুনবেন। প্রাচ্যলোকের অন্তরের মর্মে ফিরে আসা জীবনকে আবার নতুন করে নির্মাণ করার প্রত্যাশায় থাকি।
>
> সেই অর্থে সাম্প্রতিক জাপানের উন্নতি ও তার ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল ও উন্নতিশীল কাজের জন্য আমি অত্যন্ত প্রত্যাশাতে আছি। কেননা জাপান অসীম প্রাচ্যের অতীত থেকে জন্মেছিল। সেই দেশ বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করেছে, কিন্তু কখনই বস্তুতন্ত্রবাদে (materialism) নিয়ন্ত্রিত হয়নি। বরং বস্তুবাদ দমন করে প্রাচ্যগত জাপান নিজস্ব নতুন সভ্যতা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-প্রধান (spiritualist) সভ্যতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা রয়েছে জাপানের।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন ও জীবনদর্শনের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কোনো ব্যবধান নেই। উভয়েরই উদ্দেশ্য মানুষের মুক্তি ও শান্তি। তাঁর ধর্মদর্শন রাজনীতিতে এবং রাজনৈতিক দর্শন কর্মজীবনে অনুশীলিত হলে ব্যক্তির ও সমষ্টির তথা মানবসমাজের কল্যাণের পথ সুগম হতো।*

* জাপান সফরসংক্রান্ত তথ্যের জন্য অন্যান্য সূত্রসহ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্র-জীবনী* এবং প্রদীপ্ত সেনের 'জাপান ও রবীন্দ্রনাথ' (*জগজ্জ্যোতি*) শীর্ষক রচনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

পারস্যে ভাববিনিময়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের বাইরে যেখানেই সফরে গেছেন, সেখানকার আধ্যাত্মিক ও ভাবজগতের সন্ধান করেছেন। নিজের দেশের কল্যাণের লক্ষ্যে সেখান থেকে ভালো কিছু নিয়ে আসা যায় কি না, সে চেষ্টা করেছেন। আগে সফর করেছেন পশ্চিমে-দক্ষিণে—ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও আর্জেন্টিনা; প্রাচ্যে জাপান ও চীন। প্রাচ্যের আরেক গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা পারস্য সফর করে তিনি তাঁর বিশ্ব-পরিক্রমায় পরিসমাপ্তি ঘটান। ইরান সফরের পরে আরও নয় বছর তিনি বেঁচে ছিলেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানে গেছেন, কিন্তু বিদেশে আর যাননি। তার জন্য দায়ী অবশ্য তাঁর বার্ধক্য ও দুর্বল স্বাস্থ্য।

সে যুগে যখন যোগাযোগব্যবস্থা এখনকার মতো সহজ ছিল না, সেই সময় বিভিন্ন দেশ, যার বেশির ভাগই উন্নত দেশ, সফর করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সৌন্দর্যবাদী কবি ওইসব দেশের নৈসর্গিক শোভা উপভোগের জন্য যেতেন না। তাঁর সফরনামা পাঠ করে বোঝা যায়, ওইসব দেশের মানুষকে তিনি তাঁর কবিতা শোনাতেও যাননি, সেখানকার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে স্রেফ আলাপ-আলোচনাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি প্রধানত সেখানকার ভাবুকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। নিজের পরাধীন দেশের উন্নতিতে, জনগণের কল্যাণে ওইসব দেশের কোনো চিন্তা ও কর্মসূচি কাজে লাগানো যায় কি না, তা অনুসন্ধান করেছেন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে।

ইরানের সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বহু শতাব্দীর। প্রাচীন ফারসি সাহিত্য ও ইরানের সুফি ও মরমি

ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল শৈশব থেকেই এবং তাঁর জীবনে তার প্রভাব ছিল স্থায়ী। মূল ভাষায় মুহাম্মদ শামস্ উদ্‌দীন হাফিজের (১৩২৫-১৩৮৯) *দিওয়ান* ও অন্যান্য ফারসি কাব্য ঠাকুরবাড়ির অনেকেই পাঠ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন হাফিজের অত্যন্ত অনুরাগী। পিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে রবীন্দ্রনাথও হাফিজের মরমি ভাবধারায় সিক্ত হন শৈশবেই। সে কথা তিনি বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন। হাফিজের সুফিবাদী দর্শন তাঁর নিজের সংস্কারমুক্ত জীবনদর্শন গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

হাফিজের সমাধি দেখতে গিয়ে সিরাজের গভর্নরের সঙ্গে আলাপকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> দুর্ভাগা ভারতবর্ষ, জটিল ধর্মের পাকে আপাদমস্তক জড়ীভূত ভারতবর্ষ। অন্ধ-আচারের বোঝার তলে পঙ্গু আমাদের দেশ, বিধিনিষেধের নিরর্থকতায় শতধাবিভক্ত আমাদের সমাজ।

ধর্মীয় আচার ও অনড় বিধিনিষেধের প্রথম জীবন থেকেই বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কোনো এক দূর অতীতে কারও শিখিয়ে দেওয়া রীতিনীতি ও শিক্ষা দিয়ে চিরকালের মানুষের প্রয়োজন মিটতে পারে না। সমাজ-প্রগতির স্বার্থে ধর্মপালনে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। কিন্তু সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম সে স্বাধীনতার ওপর আরোপ করে কড়া শাসন ও বিধিনিষেধ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওইসব আচার ও বিধিনিষেধের বিরোধী। নিজস্ব ধর্মপালনে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি মূল্য দিয়েছেন। তিনি ইরান সফরকালে লিখেছেন :

> সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরাকালের কোনো একটা বাধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন।

রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ধর্মাচারকে মূল্য দেননি, সে সবের বিরোধিতা করে জোরালোভাবে কিছু না বললেও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস সুফিদের মতোই উদার ও কোনো বিশেষ আচারে আবদ্ধ নয় : যে যেভাবে পারে স্রষ্টার সান্নিধ্য ও করুণা লাভের চেষ্টা করতে পারে। ইরান সফরকালে ৪ মে ১৯৩২, তেহরানে কয়েকজন শিয়া মুসলিম ধর্মনেতা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কয়েকজন মোল্লা' তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন :

> ইতিমধ্যে একদিন প্রধান রাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে বললুম, বহুযুগের উগ্র সংস্কারকে নম্র করে দিয়ে তাঁরা এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবুদ্ধিকে নির্বিষ করেছেন এই দেখে আমি আনন্দিত।

তিনি বললেন, 'যতটা আমাদের ইচ্ছা ততটা সফলতা এখনো পাইনি। মানুষ তো আমরা সকলেই, আমাদের মধ্যে মানুষোচিত সম্বন্ধ সহজ ও ভদ্র না হওয়াই অদ্ভুত।

আমি যখন বললুম পারস্যের বর্তমান উন্নতিসাধনা একদিন হয়তো ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থল হতে পারে, তিনি বললেন, 'রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। মনে রাখতে হবে, পারস্যের জনসংখ্যা এক কোটি বিশ লাখ, ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটির উপর—এবং সেই ত্রিশ কোটি বহুভাগে বিভক্ত। পারস্যের সমস্যা অনেক বেশি সরল, কেননা আমরা জাতিতে ধর্মে ভাষায় এক। আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে শাসনব্যবস্থাকে নির্দোষ এবং সম্যক উপযোগী করে তোলা।

আমি বললুম, দেশের প্রকাণ্ড আয়তনটাই তার প্রকাণ্ড শত্রু। চীন ভারতবর্ষ তার প্রমাণ। জাপান ছোটো বলে এত শীঘ্র বড়ো হয়েছে। স্বভাবতই ঐক্যবদ্ধ অন্য সভ্যদেশের রাষ্ট্রনীতি ভারতবর্ষে খাটবে না। এখানকার বিশেষ নীতি নানা দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে এখানেই উদ্ভাবিত হবে।

তিনি চলে গেলে আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম ঐক্যটাই আমাদের দেশে সব-প্রথম ও সবচেয়ে বেশি চাই, অথচ ঐক্যের বাধা আমাদের হাড়ে হাড়ে। ভারতীয় মুসলমানের গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে একান্ত কঠিন করে বাঁধে, বাইরেকে দূরে ঠেকায়, হিন্দুর গোঁড়ামি নিজের সমাজকে নিজের মধ্যে হাজারখানা করে, তার উপরেও বাইরের সঙ্গে তার অনৈক্য। এই দুই বিপরীতধর্মী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমাদের দেশ। এ যেন দুই যমজ ভাই পিঠে পিঠে জোড়া; একজনের পা ফেলা আর একজনের পা ফেলাকে প্রতিবাদ করতেই আছে। দুইজনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাও যায় না, সম্পূর্ণ এক করাও অসাধ্য।'

'কয়েকজন মোল্লা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রধান মোল্লা প্রশ্ন করলেন, নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থে নানা পথ নির্দেশ করে, তার মধ্য থেকে সত্য পথ নির্ণয় করা যায় কী উপায়ে!

আমি বললুম, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'আলো পাব কী উপায়ে', তাকে কেউ উত্তর দেয় চকমকি ঠুকে—কেউ বলে তেলের প্রদীপ, কেউ উত্তরে বলে মোমের বাতি, কেউ বলে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে। সেই সব উপকরণ ও প্রণালী নানাবিধ, তার ব্যবহার যথেচ্ছ, তার ফল সমান নয়। যারা পুঁথি সামনে রেখে কথা কয় না, যাদের সহজ বুদ্ধি, তারা বলে 'দরজা খুলে দাও'। ভালো হও, ভালোবাসো, ভালো করো, এইটেই হল পথ। যেখানে শাস্ত্র এবং তত্ত্ব এবং আচারবিচারের কড়াকড়ি, সেখানে ধার্মিকদের অধ্যবসায় কথা-

কাটাকাটি থেকে শুরু করে গলা-কাটাকাটিতে গিয়ে পৌঁছয়।

মোল্লার পক্ষে তর্কের উদ্যম ফুরোয়নি, কিন্তু আমার আর সময় ছিল না।

[*পারস্যযাত্রী*, পৃ.৭৯]

তবে অনুমান করা যায়, তাঁর যথেষ্ট সময় থাকলেও রবীন্দ্রনাথ আর বেশি কথায় জড়াতেন না। কারণ তাঁর যা বলার সংক্ষেপে তা বলেই দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের জনগণের অনৈক্য, সাম্প্রদায়িক হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জাতীয় অগ্রগতির পথে যেসব বাধা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে সে কথা ইরান সফরের সময় রবীন্দ্রনাথের মনে উদয় হয়। স্বদেশের দুরবস্থার কথা ভেবে তাঁর দুঃখ হয়। তিনি লিখেছেন :

> বোঝা গেল পুরাতনের খোলস বিদীর্ণ করে পারস্য আজ নূতন প্রাণের পালা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যেখানে জাগরণের চাঞ্চল্য সেখানে এই একই ভাব। অতীতের-আবর্জনা-মুক্ত সমাজ, সংস্কারমুক্ত চিত্ত, বাধামুক্ত মানবসম্বন্ধের ব্যাপ্তি, বাস্তব জগতের প্রতি মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, এই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। তারা জানে—হয় বর্তমান কালের শিক্ষা নয় তার সাংঘাতিক আঘাত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অতীত কালের সঙ্গে যাদের দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিবন্ধনের জটিলতা, মৃত যুগের সঙ্গে আজ তাদের সহমরণের আয়োজন।
>
> এখানে পরধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরকম ব্যবহার এই প্রশ্নের উত্তরে শুনলুম পূর্বকালে জরথুস্ত্রীয় ও বাহাইদের প্রতি অত্যাচার ও অবমাননা ছিল। বর্তমান রাজার শাসনে পরধর্মমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা দূর হয়ে গেছে; সকলেই ভোগ করেছে সমান অধিকার, ধর্মহিংস্রতার নররক্তপঙ্কিল বিভীষিকা কোথাও নেই।
>
> [*পারস্যযাত্রী*]

নিরেট বস্তুবাদের সমালোচনা করলেও পাশ্চাত্য সভ্যতার নিন্দুক ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। সেখানকার ভালো জিনিসগুলোর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন তিনি। বস্তুবাদকে অগ্রাহ্য করেনি, কিন্তু সত্যসাধনায় জোর দিয়েছেন অধ্যাত্মবাদের ওপর :

> একদা সেই জাগ্রত দেবতার লীলাক্ষেত্র বহু শতাব্দী ধরে এসিয়ায় ছিল। তখন এখানেই ঘটেছে মানুষের নব নব ঐশ্বর্যের প্রকাশ নব নব শক্তির পথ দিয়ে। আজ সেই মহামানবের উজ্জ্বল পরিচয় পাশ্চাত্য মহাদেশে। আমরা অনেক সময় তাকে জড়বাদপ্রধান বলে খর্ব করবার চেষ্টা করি। কিন্তু কোনো জাত মহত্ত্বে পৌঁছতেই পারে না একমাত্র জড়বাদের ভেলায় চড়ে। **বিশুদ্ধ জড়বাদী হচ্ছে বিশুদ্ধ বর্বর**। সেই মানুষই বৈজ্ঞানিক সত্যকে লাভ করবার অধিকারী সত্যকে যে শ্রদ্ধা ক'রে পূর্ণ মূল্য দিতে পারে। এই শ্রদ্ধা

আধ্যাত্মিক, প্রাণপণ নিষ্ঠায় সত্যসাধনার শক্তি আধ্যাত্মিক। পাশ্চাত্য জাতি সেই মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি-দ্বারাই সত্যকে জয় করেছে এবং সেই শক্তিই জয়ী করেছে তাদের।

[*পারস্যযাত্রী*]

শিশুর হাতে বিপজ্জনক খেলনার মতো বিজ্ঞানকে পশ্চিমের নেতারা ব্যবহার করছিলেন, যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ ছিল না। যে বিজ্ঞানের কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য নেই সেই বিজ্ঞানকে রবীন্দ্রনাথ মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইরান ঘুরে এসেই তিনি লিখেছেন :

দেশে ফিরে এলুম। তার অনতিকালের মধ্যেই য়ুরোপে বাধল মহাযুদ্ধ। তখন দেখা গেল বিজ্ঞানকে এরা ব্যবহার করছে মানুষের মহা সর্বনাশের কাজে। এই সর্বনাশা বুদ্ধি যে আগুন দেশে দেশে লাগিয়ে দিল তার শিখা মরেছে, কিন্তু তার পোড়া কয়লার আগুন এখনও মরেনি। এতবড়ো বিরাট দুর্যোগ মানুষের ইতিহাসে আর কখনোই দেখা দেয়নি। একেই বলি জড়তত্ত্ব; এর চাপে মনুষ্যত্ব অভিভূত, বিনাশ সামনে দেখেও, নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

[*পারস্যযাত্রী*, পৃ.১৮]

অন্যকে মারতে গিয়ে জাপানকে যে মার খেতেই হবে তাতে দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল না। যখন জাপানে গিয়েছিলেন তখন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মুসোলিনী বা হিটলারের আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু যখন তিনি ইরান সফর করেন তখন তাঁরা উভয়েই প্রবলভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। জাপানের অগ্রযাত্রাও অপ্রতিহত। ইউরোপের 'পশুগর্জন' রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছেছিল, এশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি ছিলেন উৎকণ্ঠিত। তিনি তাঁর ইরান সফরনামায় প্রসঙ্গক্রমেই লিখেছিলেন :

নূতন যুগে মানুষের নবজাগ্রত চৈতন্যকে অভ্যর্থনা করবার ইচ্ছায় একদিন পূর্ব-এসিয়ায় বেরিয়ে পড়েছিলুম। তখন এসিয়ার প্রাচ্যতম আকাশে জাপানের জয়পতাকা উড়ছে, লঘু করে দিয়েছে এসিয়ার অবসাদচ্ছায়াকে। আনন্দ পেলুম, মনে ভয়ও হল। দেখলুম জাপান য়ুরোপের অস্ত্র আয়ত্ত করে এক দিকে নিরাপদ হয়েছে, তেমনি অন্য দিকে গভীরতর আপদের কারণ ঘটল। তার রক্তে প্রবেশ করেছে য়ুরোপের মারী, যাকে বলে ইম্পীরিয়ালিজম, সে নিজের চারিদিকে মথিত করে তুলছে বিদ্বেষ। তার প্রতিবেশীর মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এই প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করবার নয়, আর এই জ্বালায় **ভাবীকালের অগ্নিকাণ্ড** কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। ইতিহাসে ভাগ্যের অনুকূল হাওয়া নিরন্তর বয় না। এমন দিন আসবেই যখন আজ যে দুর্বল তারই কাছে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ'নে দিতে হবে। কী করে

মিলতে হয় জাপান তা শিখল না, কী করে মারতে হয় য়ুরোপের কাছ থেকে সেই শিক্ষাতেই সে হাত পাকিয়ে নিলে। এই মার মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে একদিন এসে ছোবল মারবে তারই বুকে।

কিন্তু এতে রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবের ভুল হল ব'লেই এটা শোচনীয় এমন কথা আমি এই বলতে চাই, এসিয়ায় যদি নূতন যুগ এসেই থাকে তবে এসিয়া তাকে নূতন করে আপন ভাষা দিক। তা না করে য়ুরোপের পশুগর্জনের অনুকরণই যদি সে করে, সেটা সিংহনাদ হলেও তার হার। ধার-করা রাস্তা যদি গর্তের দিকে যাবার রাস্তা হয় তা হলে তার লজ্জা দ্বিগুণ মাত্রায়। যা হোক, এসিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে তার খবর দূর থেকে শোনা যায়। যখন ভাবছিলুম তুরস্ক এবার ডুবল তখন হঠাৎ দেখা দিলেন কামালপাশা। তখন তাঁদের বড়ো সাম্রাজ্যের জোড়াতাড়া অংশগুলো যুদ্ধের ধাক্কায় গেছে ভেঙে। সেটা শাপে বর হয়েছিল। শক্ত করে নতুন করে রাজ্যটাকে তার স্বাভাবিক ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তোলা সহজ হল ছোটো পরিধির মধ্যে।

[পারস্যযাত্রী]

রবীন্দ্রনাথের এসব কথা একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল নরম ও সরু, তেমনি তাঁর দার্শনিক বক্তব্য মৃদু ভাষায় বলে গেছেন। বিশ্বপরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, দেশে দেশে তা খুব কম মানুষেরই কানে গেছে। তাঁর চিন্তার প্রভাব খুবই সীমিত। তিনি যে একজন শান্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন, সে স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক রাজনীতির যাঁরা নিয়ন্তা, তাঁদের থেকে পাওয়া যায়নি। তা পাওয়া গেলে বিশ্ব হতে পারত আরও শান্তিপূর্ণ।

উপসংহার

বাংলার নবজাগরণের যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এবং জন্ম সেই পরিবারে নবজাগরণ আনতে যার ভূমিকা সবচেয়ে অগ্রগামী, তাঁর জন্মের কিছুকাল আগেই বাংলাদেশে বহু ধর্মনেতা ও মহান সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) যখন পরলোকগমন করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ১৫ বছরের তরুণ। পাশ্চাত্য ভাবধারা ও কৃত্রিম সাহেবিয়ানা থেকে শিক্ষিত যুবসমাজকে ফিরিয়ে আনতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন এবং সংস্কারমুক্ত সরল জীবনযাপনের শিক্ষা দিতেন—তা রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। মানুষের কল্যাণ ও সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়—এই সহজ কথাটি প্রচার করেছেন তিনি। বলেছেন, 'সত্য একটাই—ঋষিরাই বলেন বহু।' এসব কথা রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন, বিশ্বাসও করেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা শোনা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) একেবারেই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি ভারত-খ্যাত। তাঁর নব-হিন্দুত্ব আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনবহিত ছিলেন না। বিবেকানন্দের অনুরাগী নিবেদিতার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কলকাতার প্লেগ মহামারির সময় তাঁরা একত্রে সেবাকাজ করেছেন। বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার, বেদান্তের নতুন ব্যাখ্যা, 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা, মানবসেবামূলক 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব ছিল। সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি সংগত কারণেই।

বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবধারায় বাংলায় যে উদ্দাম হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধারার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উদার মানবতাবাদী এবং সমন্বয়বাদী ও অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শগত মিল ছিল না। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ যতই উদার ছিলেন, তাঁর শিষ্য ও অনুসারীরা ততই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক হয়ে যান। 'সব ধর্মই সত্য—যত মত তত পথ'—কথাটা তাঁর অনুসারী অনেকের কাছে প্রশংসিত হলো বটে, কিন্তু তাঁরা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুশাস্ত্রই একমাত্র সত্য বলে সাবলীলভাবে প্রচার করতে থাকেন—অন্য ধর্মের সত্য হয়ে গেল মূল্যহীন।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা। সেই ধর্মসাধক পিতার কাছে শৈশবে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার শুরু—যার সমাপ্তি 'মানুষের ধর্ম'-এ গিয়ে। উপনিষদ ও গীতা পাঠ করে তিনি আরও সমৃদ্ধ হন এবং বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত হিন্দুধর্মীয় দর্শন সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান হয়। তবে অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র যেমন স্মৃতি, ন্যায়, নব্য-ন্যায় প্রভৃতির চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তবে কেউ কেউ লিখেছেন, 'যদিও রবীন্দ্রনাথ গীতা তেমন পছন্দ করতেন না, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু হিন্দুধর্ম নয় বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন মতবাদের এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলো নিয়ে তাঁর নিজস্ব ব্রহ্মদৃষ্টি, বিশ্বদৃষ্টি বা worldview গড়ে তোলেন। একজন সাধক সত্যের সন্ধান করেন নানা সূত্র থেকে, কোনো একটিমাত্র সূত্র থেকে নয়, রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন আজীবন।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু হিন্দুত্বের যা কিছু ভালো ও শ্রেষ্ঠ তা তিনি তাঁর ব্রাহ্মধর্মে গ্রহণ করেছেন। একসময় প্রশ্ন উঠেছিল খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মতো ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না? এর জবাবে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেন, ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই একটি অঙ্গ হিসেবে। বহু জাতি, বহু ধর্মাবলম্বীর আবাসভূমি হলেও হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে হিন্দুসংস্কৃতিই প্রাধান্য পাবে—সে ব্যাপারে তাঁর যেমন সংশয় ছিল না, তেমনি হিন্দুত্ববাদের উত্থানেও সায় ছিল না।

জন্মসূত্রে একজন ব্রাহ্ম হিসেবে তিনি হিন্দুধর্মের অবতারবাদ ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা করতেন। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন ধর্মজীবনের অধিকারী। দেবেন্দ্রনাথের মতোই একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু পিতা অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা দিতেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। জীবনরসিক রবীন্দ্রনাথের কাছে

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' নীতিটি অভ্রান্ত মনে হয়নি। শুধু ত্যাগের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা সম্ভব—তা-ও তিনি বিশ্বাস করতেন না। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্যসমুৎপাতে এবং ক্ষণিকত্ববাদে তাঁর আস্থা ছিল না। তবে বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সর্বব্যাপী আনন্দ, করুণা প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধের বাণীকে রবীন্দ্রনাথ সব মানুষের জন্য গ্রহণীয় মনে করতেন।

ইসলামি সুফিবাদ ছিল তাঁর একটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। মুসলিম সুফিদের জীবনযাপনের সঙ্গে তাঁর নিজের জীবনযাপনের কখনো মিল পাওয়া যায়, তাঁর সময়ের আর কোনো নিষ্ঠাবান হিন্দু বা খাঁটি ব্রাহ্মর সঙ্গে তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো মিল নেই। তিনি একেবারেই আলাদা।

তিনি কাউকে গুরু মানেননি, কোনো শিষ্য তৈরি করেননি, তিনি কারও ধর্মীয় গুরুও ছিলেন না, কারণ গুরুবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তবে তাঁর উদার ধর্মীয় আদর্শে শান্তিনিকেতনের অনেকেই দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতোই অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবতাবাদী। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন কিন্তু শিষ্য বলতে যা বোঝায়, তাঁরা তা ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথ কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন? অনেকবার তিনি বলেছেন, 'আবার যদি এদেশে জন্মগ্রহণ করি...' এতে অনুমান করা যায় যে পুনর্জন্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এটা স্রেফ কথার কথাও হতে পারে, কারণ, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। সে সম্পর্কে ভেবে অপচয় করার মতো প্রচুর সময় তাঁর ছিল না।

নিজে মরমি ও মানবতাবাদী বলেই বাংলার বাউল ও গ্রামীণ মরমি লোককবিদের তিনি মূল্যায়ন করেছেন এবং তাঁদের গানের বাণীকে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন। শুধু মহাত্মা লালনই নন, হাসন রাজাকেও তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত করেন তাঁর সর্বেশ্বরবাদী আধ্যাত্মিক দর্শনের কারণে।

বাউলদের মতো তিনি 'মনের মানুষের' সন্ধান করেছেন আজীবন। তিনি বলেছেন তাঁর 'জীবনদেবতা'র কথা, যিনি নেপথ্যে থেকে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন।

অতীতের কোনো এক সময় প্রবর্তিত ধর্মের দ্বারা অনাগতকালের মানুষের জীবন পরিচালিত হবে, নতুন যুগের সমস্যা সমাধানে নতুন প্রশ্ন মানুষের মনে

জাগবে না, তা মানতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে নতুন যুগে নতুন ধর্মাদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নতুন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে, যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই। মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক, যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনে সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।

একটি পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 'একটি ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ গড়ে' তোলার কথা ভেবেছেন। তবে তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি সংগত কারণেই, কারণ তাতে অনর্থক বিতর্কের সৃষ্টি হতো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে। তাহলে, তিনি কি সব প্রচলিত একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর বিলুপ্তি চেয়েছেন? বৈদিক ধর্মও একেশ্বরবাদী, খ্রিষ্টান ধর্মও একেশ্বরবাদী, ইসলাম ধর্মও একেশ্বরবাদী। আরও একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় রয়েছে। সে রকম কোনো প্রস্তাব তাঁর কোনো প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর লেখালেখি থেকে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে, ভারতবর্ষের মানুষের সংহতির স্বার্থে 'একটি ভারতবর্ষীয় একেশ্বরবাদী সমাজ' তাঁর কাম্য ছিল। কিন্তু কাজটি কঠিন। প্রাচীনকালের ধর্মপ্রবর্তকদের মতো অলৌকিক ও জাদুকরি প্রভাবসম্পন্ন কোনো মহামানবের একালে আবির্ভাব ঘটা অসম্ভব—তা তিনি খুব ভালোই জানতেন। শত শত বছরের সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস তাদের ভেতরে এতটাই বদ্ধমূল—সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে সেখান থেকে নড়ানোর ক্ষমতা নতুন কোনো ধর্মীয় মতবাদের নেই। ফলে পুরোনো ধর্মমতের যুগের উপযোগী সংস্কারের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার নয়।

রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্মজীবন ছিল একজন বড় ধর্মসাধকের। সাধনায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণ তাঁর কাছে মোটেই মুখ্য ছিল না। যদিও প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনিও স্রষ্টার নৈকট্য ও করুণা কামনা করতেন। 'ভূমা'র সঙ্গে মিলনকে পরম জীবনব্রত মনে করতেন। শুধু গদ্যরচনায় নয়, কবিতা ও গানেও তিনি তাঁর ভক্তহৃদয়ের আকুতি নিবিড় ঐকান্তিকতায় প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কোনো একাডেমিক দার্শনিক ছিলেন না, কোনো দার্শনিক তত্ত্বের তিনি স্রষ্টা নন। কিন্তু ছিল তাঁর নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টি। মানবজীবন, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর চিন্তা। সেগুলোকেই বলব আমরা তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা।

রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় এমন উপাদান রয়েছে যার দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে লাভবান হতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, তাঁর চিন্তার কোনো প্রভাব ভারতের বাইরে অন্য কোথাও লক্ষ করা যায় না। যদিও একাডেমিক পর্যায়ে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। তবে তা খুব ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরেই আবদ্ধ। উপমহাদেশের বাইরে আধুনিক পাঠকের তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ অল্প। যদিও একালের অনেক ভারতীয় ভাবুকের রচনা পশ্চিমে পঠিত, আলোচিত, বিশ্লেষিত ও সমাদৃত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পাঠক অতি সীমিত। পশ্চিমের তরুণ পাঠকসমাজে তিনি বিশেষ পরিচিত নন। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি বা অমর্ত্য সেন প্রমুখ যত পরিচিত ও পঠিত, রবীন্দ্রনাথ তত নন। শুধু বাঙালির কাছেই রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য। ভারতের অন্য ভাষাভাষীর কাছে রয়েছে তাঁর গুরুত্ব জাতীয় কবি হিসেবে, তাঁর চিন্তারও আবেদন রয়েছে অল্প পরিমাণে। যদিও আধুনিক সংঘাতময় সময়ে তাঁর চিন্তার অনুশীলন মানবসমাজের মঙ্গল বয়ে আনতে পারে। তবে এখন আবেদন সীমিত হলেও পৃথিবীতে যুগে যুগে যাঁরা মানবতাবাদী চিন্তাচেতনার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন, দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, তাঁদের পঙ্‌ক্তিতেই স্থান পাবেন রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মদর্শন-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা

গ্রন্থ

মানুষের ধর্ম

ধর্ম [১৩১৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাতে রয়েছে: উৎসব, দিন ও রাত্রি, মনুষ্যত্ব, ধর্মের সরল আদর্শ, প্রাচীন ভারতের একঃ, প্রার্থনা, ধর্মপ্রচার, বর্ষশেষ, নববর্ষ, উৎসবের দিন, দুঃখ, শান্তং শিবমদ্বৈতম, ততঃকিম, এবং আনন্দরূপ।]

শান্তিনিকেতন [১৭ খণ্ড, ১৯০৯-১৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও বিভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও উপদেশমূলক রচনা, যার মূল প্রতিপাদ্য ধর্ম]

ভারতপথিক রামমোহন

Philosophy of Leisure, Calcutta

The Religion of an Artist, Calcutta

Religion of Man, Allen & Unwin, London

Personality, London

প্রবন্ধ

'নিরাকার উপাসনা'—শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ, ৭ পৌষ ১৩০৫। শান্তিনিকেতনে এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধর্মদেশনা। *ভারতী*, মাঘ ১৩০৫

'ব্রহ্মোপনিষদ'—শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত, ৭ পৌষ ১৩০৬

'ব্রহ্মমন্ত্র'—শান্তিনিকেতন মন্দিরে পঠিত, ৭ পৌষ ১৩০৭

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'—কলকাতা মাঘোৎসবে পঠিত, ১১ মাঘ ১৩০৭

['ব্রহ্মচারীদের প্রতি উপদেশ']—৮ পৌষ ১৩০৮

'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা', 'ধর্মের অধিকার', *সঞ্চয়*
'ধর্মের নবযুগ', সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'ধর্মশিক্ষা', সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'হিন্দুব্রাহ্ম', পরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'আত্মপরিচয়', পরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'রূপ ও অরূপ', সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'ধর্মের অর্থ', সঞ্চয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* ১৮
'Man' [অক্স্ফ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, ১৯৩৩]

গ্রন্থপঞ্জি

আবুল আহসান চৌধুরী, *মনের মানুষের সন্ধানে*, ঢাকা, ১৯৯৫
আবু সয়ীদ আইয়ুব, *পান্থজনের সখা*, কলকাতা, ১৯৭০
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, কলকাতা, ১৩৭৮
গোপীনাথ কবিরাজ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা
চিন্মোহন সেহানবিশ, *রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক চিন্তা*, কলকাতা
চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, কলকাতা, ২০০৩
জয়তী ঘোষ, *বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৬২
: *ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ*, প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, ১৮৫০
: *আত্মতত্ত্ববিদ্যা*, কলকাতা, ১৮৫২
: *ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস*, কলকাতা, ১৮৬০
নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* (ছয় খণ্ড), কলকাতা
নবেন্দু সেন, *গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলকাতা, ১৯৭১
মৈত্রেয়ী দেবী, *রবীন্দ্রনাথ—গৃহে ও বিশ্বে*, কলকাতা
মুহাম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, ঢাকা
ভবসিন্ধু দত্ত, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত*, কলকাতা, ১৯১৪
শশীভূষণ দাশগুপ্ত, *উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস*, কলকাতা, ১৯৬১
শিবনাথ শাস্ত্রী, *ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৭১
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য*, কলকাতা, ১৯৮৪
সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বেদান্তদর্শন*, পাটনা, ১৯৩১
ক্ষিতিমোহন সেন, *কবীর*, কলকাতা, ১৯৯৫
Ayyub, Abu Sayeed, *Tagore's Quest*, Kolkata, 1980
Brodov, V., *Indian Philosophy in Modern Times*, Moscow, 1984

Farquhar, J. N., *An Outline of the Religious Literature of India*, London, 1920
Karim, Abdul., *Social History of the Muslims in Bengal*
Lal, B.K., *Contemporary Indian Philosophy*, Delhi, 1996
Nizami, K. A., *Religion and Politics in India during the Thirteenth Century*
Russell, Bertrand, *The Autobiography of Bertrand Russell* 1872-1914, London,1967
S.Radhakrishnan, *The Philosophy of Rabindranath Tagore*, Kolkata, 1961
Thilly, Frank, *A History of Philosophy*, New York, 1957
Westcott, G. H., *Kabir and the Kabir Panth*, Cawnpore, 1907

প্রবন্ধ

কাজুও আজুমা, 'রবীন্দ্রনাথ ও মাসাহারু আনেসাকি'
প্রদীপ্ত সেন, 'জাপান ও রবীন্দ্রনাথ', *জগজ্জ্যোতি*
Ayyub, Abu Sayeed, 'Is that year delight?', *The Visvabharati Quarterly*, May 1975-April 1976

পত্রপত্রিকা

প্রবাসী
জগজ্জ্যোতি
Modern Review
Viswa-Bharati Quarterly